মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ সাহেব রচিত ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে’

রাষ্ট্র ও রাজনীতি

গ্রন্থের

পর্যালোচনা

আবদুল্লাহ বিন বশির

প্রথম পর্ব:

আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে লেখক সম্পর্কে আমার অবস্থান বলে নিই, কারণ অনেকেই হয়তো জল ঘোলা করার চেষ্ঠা করবেন।

শ্রদ্ধেয় লেখককে আমি একজন মুরব্বি ও সম্মানিত আলেম হিসেবে বিশ্বাস করি, যিনি ইলমের খেদমতে তার জীবনকে ওয়াকফ করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং নিজের পরিবারকেও তিনি ইলমে দ্বীন শিখিয়েছেন, এবং তারা এখন ইলমের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে।

.

লেখকের এই বইটি যখন প্রথম পড়ি তখনই আমি বইটির একটি পর্যালোচনা লেখার প্রস্তুতি নেই। কিন্তু যখন শুনতে পেলাম, মুহতারাম লেখক বইটি বাজার থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। যতদূর মনে পড়ে কিছু ভাইকে বলেছিলামও—আমাদের বড়দের সৌন্দর্য এটাই; ভুল হয়েছে, কেউ হয়তো ধরিয়ে দিয়েছেন, তাই পুরো বই উঠিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন দেখলাম ‘‘মুআসসাসা ইসলামিয়্যা বাংলাদেশ’’ থেকে বইটি প্রকাশের ঘোষণা দেওয়া হলো! একদিকে খুশিও হলাম, তাহমিদুল মাওলা সাহেবসহ দেশের বেশকিছু বিজ্ঞ আলেমের পরিচালিত প্রকাশনী থেকে বইটি নতুন করে আসছে, এবার হয়তো ভালো কিছুই হবে, কিন্তু ভিতরে একটা কেমন জানি খটকা রয়ে গেলো।

ইসলামি সিয়াসাত বিষয়ে আমার যেহেতু বেশ কিছুদিন থেকে আগ্রহ আছে, মুতাকাদ্দিমীন ও সমকালীন আলেমদের আলহামদুলিল্লাহ একটা অংশ এই বিষয়ে পড়েছি ও সংগ্রহ করেছি, এবছর মাদরাসায় আমার জিম্মায় সিয়াসাত পড়ানোরও দায়িত্ব ছিলো, তাই হুজুরের বইটির বেশ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম। অতঃপর বইটি বের হলো, পড়লাম, এবং আগের এডিশনের থেকেও বেশি হতাশ হলাম।

.

যাইহোক, বইটির বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ। এই পর্বে মদিনার সনদ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করবো। মদিনার সনদের ব্যাপারে মুহতারাম লেখক লেখেন,

“মদিনায় হিজরতের করেই নবীজী সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র তৈরি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন ... আনসার ও মুহাজির এবং মুশরিক ও ইহুদিদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে তোলেন।... মদিনা সনদ হলো আলোকিত মানব সভ্যতার মাইলফলক।”

মুহতারাম লেখক এখানে কয়েকটি দাবী করতে চেয়েছেন,

১. মদিনা সনদ ইসলামের প্রথম সংবিধান।

২. এই সনদ মুসলিম ও ইহুদিদের সাথে আলোচনা করে তৈরি।

এরপর সম্মানিত লেখক এই সনদের একেকটি মহত্ব নিয়ে বিশাল আলাপ করেছেন, যার পরিমাণ প্রায় ২৫ পৃষ্ঠা (৬৫ থেকে ৮৯)। সেখানে মদিনা সনদের প্রতিটি ধারার বিশ্লেষণসহ অনেক কিছুই লিখেছেন তিনি। কিন্তু...

কিন্তু পুরো এই আলোচনায় মুহতারাম লেখক সাহেবের মনে কী একটি বার এই খটকা আসেনি যে, ‘মদিনার সনদ’ বলে লেখক যেগুলোকে ইসলামি রাষ্ট্রের আহকাম হিসেবে দাবি করছেন, আসলেই তা প্রমাণিত আছে কি না?

মদিনা সনদের বাস্তবতা:

বাস্তব কথা হলো, মদিনা সনদ কোনো সহিহ সনদ দ্বারাই প্রমাণিত না। এ বিষয়ে যতগুলো হাদিসের সনদ রয়েছে তার সবগুলোই যয়ীফ। সহিহ সনদে এর কোনো ভিত্তি নেই। আরবের বহু আলেম এই মদিনা সনদের খণ্ডন করেছেন, অনেকে তো এটাকে জাল পর্যন্ত বলেছেন। পরবর্তীতে সিরাতের গবেষক ড. আকরাম জিয়া উমারি এই বিষয়ে বিস্তর তাহকিক করার পর সিদ্ধান্ত দেন,

وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفة، ولكن الوثيقة لا ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة،

‘মদিনার সনদ’ জাল একটি ধারণাপ্রসুত বক্তব্য, তবে মদিনা সনদের সবগুলো সনদ একসাথে করলেও সহিহ হাদিসের স্তরে পৌঁছাবে না। (আসসিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আসসহিহাহ ১/২৭৫)

এছাড়া ড. মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল আউশিন/উশান তার কিতাব "মাশাআ ওলাম ইয়াসবুত ফিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ" ও ড. দ্বীদান আলইয়ামি "বায়ানুল হাকিকত ফিল হুকমি আলাল ওয়াসিকত" কিতাবে এই সক্রান্ত বেশ তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এছাড়া মদিনা সনদের সনদগুলোর দূর্বলতা নিয়ে মরহুম আলবানী সাহেব তার কিতাব "দিফা আনিল হাদিসিন নাবাবিয়্যাহ ওয়াসসিরাহ" তে লেখেছেন।

স্বাভাবিক একটি প্রশ্ন আসে— যয়ীফ হাদিস হলে কী সমস্যা? বিভিন্ন সনদ শক্তিশালী হলে তার থেকে বিধান নিতে সমস্যা কী? এর উত্তরে ড. আকরাম জিয়া উমারির বক্তব্য উল্লেখ করাকেই যথেষ্ঠ মনে করছি। তিনি লেখেন,

وإذا كانت الوثيقة بمجموعها لا تصلح للإحتجاج بها في أحكام الشريعة سوى ما ورد منها في كتب الحديث الصحيحة - فإنها تصلح أساساً للدراسة التاريخية التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها الأحكام الشرعية خاصة أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة

"**এক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের কিতাব সমূহে বর্ণিত চুক্তিসমূহ ছাড়া সমগ্র মদিনা সনদটি শরীয়তের কোন বিধান সাব্যস্ত করার জন্য দলীল হওয়ার উপযুক্ততা রাখে না**, তবে ইতিহাস পাঠের একটি মৌলিক ভিত্তি হওয়ার জন্য যে পরিমাণ যোগ্যতা ও উপযুক্ততা দরকার তা তার মাঝে রয়েছে। অর্থাৎ যে পরিমাণ সিহহাত তথা উপযুক্ততা ইতিহাস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু শরীয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয় (সেটা তার মাঝে বিদ্যমান)। বিশেষ করে এই চুক্তিনামাটি অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে তার মাঝে (ইতিহাস প্রমাণিত হওয়ার) কুওয়াত তথা শক্তি রয়েছে।" (আসসিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আসসহিহাহ ১/২৭৫)

এটা মদিনা সনদের সর্বোচ্চ পর্যায় হলেও ইতিহাসের একটা অংশ মাত্র! সে হিসেবে উল্লেখ হতে পারে কোনো বিধান, সংবিধান নয়! অথচ মুহতারাম লেখক এটাকেই মূল ধরে ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধান বানিয়ে ফেললেন! সংবিধান হয় একটা সর্বোচ্চ বিধান যেখান থেকে শতশত বিধান ইসতিনবাত হয়! সাধারণ বিধানের জন্যই যেখানে শক্তিশালী দলিলের প্রয়োজন, সেখানে সংবিধানের জন্য কেমন হওয়া দরকার!

এ অপ্রমাণিত থাকার কারণেই আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো ফিকহের কিতাবে এই সনদের কোনো আলোচনা নাই। সিয়াসাত নিয়ে লেখা বর্তমান এই পশ্চিমা সভ্যতা মুসলিম বিশ্বের উপর দখল প্রতিষ্ঠার আগে কোনো ফকিহ এটার উল্লেখ তাদের কিতাবে করেননি। তাই এই কথা বলার সুযোগ নেই, মদিনার সনদ 'মুতালাক্কা বিল কবুল'!

মুহতারাম লেখকের নিকট একটি প্রশ্ন, কিতাবের মধ্যে তো আপনি মাওয়ারদি, আবু ইয়ালা, ইমাম জুয়াইনিসহ অনেকের কিতাবেরই হাওয়ালা দিলেন, কিন্তু উনাদের কিতাবের কোথাও কী মদিনা সনদের দূরতমত কোনো আলোচনা পেয়েছেন? কোথাও এটা দিয়ে দলিল পেশ করতে দেখেছেন! এরপরেও একটি বারের জন্যও কী খটকা লাগেনি যে, রাসুলের সংবিধান বাদ দিয়ে উনারা সিয়াসাতের কিতাব লেখে ফেললো?

মুহতারাম লেখক এই মদিনার সনদকে মূল ধরে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার প্রমাণ করলেন, যে রাসূল অমুলিমদেরকে সাথে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ আলোচনা করে ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তুলেছেন, "আনসার ও মুহাজির এবং মুশরিক ও ইহুদিদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে তোলেন।"

অথচ সিরাতে এটা প্রমাণিত নয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদি, মুশরিক আর মুসলমানদের সাথে একসাথে বসে চুক্তি করেছেন। বরং যতটুকু দূর্বল সনদেও পাওয়া যায় সেখানে মুসলিমদের সাথে আলাদা স্বতন্ত্র চুক্তি হয়েছে, এবং ইহুদিদের সাথেও আলাদা চুক্তি হয়েছে। আকরাম জিয়া উমারির তাহকিকটিই দেখুন,

«الراجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان ثم جمع المؤرخون بينهما، إحداهما تتناول موادعة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود والثانية توضح إلتزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم.

ويترجح عندي أن وثيقة مواعدة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكبرى أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فكتبت بعد بدر»

"গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হলো, এখানে মূলত দুটি চুক্তি ছিলো। অতঃপর, ঐতিহাসিকগণ উভয়টিকে একত্র করে ফেলেছেন। একটি চুক্তি ছিলো ইয়াহুদীদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লামের সন্ধিচুক্তি। আর দ্বিতীয় চুক্তিটি ছিল মুহাজির ও আনসার মুসলিমদের অঙ্গিকার, অধিকার ও দায়িত্বসমূহের বর্ণনা সংক্রান্ত। আমার নিকটে প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য হলো, ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধিচুক্তি লিখিত হয়েছিলো বদর যুদ্ধের পূর্বে আর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে চুক্তিনামা বদরের পরে লিখিত হয়েছিলো।''(আসসিরাতুন নাবাবিয়্যাহ আসসহিহাহ ১/২৭৫)

মুহতারাম! এরপর যদি আমি ধরেও নেই মদিনা সনদের একটা হাইসিয়াত আছে, তাহলেও তো এটা সংবিধান হওয়ার মত কোনো যোগ্যতাই রাখে না। বরং অমুসলিমদের সাথে সংশ্লিষ্ট কত বিধান রহিত হয়ে গেছে! জিযিয়ার বিধান এসেছে পরে, জাযিরাতুল আরব থেকে সকল অমুসলিমদের বের করে দেওয়ার বিধান, ইত্যাদি আরো অনেক বিষয়!

বাস্তবতা হলো, এই মদিনা সনদের আলোচনা তখনই উঠে এসেছে, যখন পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মুসলিমদের ঈমানকে নষ্ট করতে থাকে, এবং তারা প্রচার করে ইসলামে কোনো রাষ্ট্রনীতি নাই, ইসলাম উগ্র ধর্ম ইত্যাদি। তখন পিছে না ভেবে কেউ এটার আলোচনা উঠায় যে ইসলামও তো সেকুলারদের মত অমুসলিমদের সমন্বয়েও গঠিত একটি রাষ্ট্র! অথচ আমাদের সিরাতের কিতাবে এটাকে সর্বোচ্চ একটি চুক্তির পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, কোনোকালেই এটাকে সংবিধান হিসেবে কেউ দেখিনি এবং আলোচনাও করেনি। আমাদের জানামতে ড. হামিদুল্লাহ রহ. এই চুক্তিকে সর্বপ্রথম ''মদিনার সনদ'' নাম দিয়ে প্রসিদ্ধ করায় মুসলমানদের মাঝে! আপনিও উনার কিতাব থেকেই দিয়েছেন। আমাদের ছোট্ট অনুসন্ধান মতে ড. হামিদুল্লাহের আগে কোনো মুসলিমের পক্ষ থেকে এটাকে সংবিধান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এমনর কোনো নজির বা হাওয়ালা নেই! বাকি যদি আপনি খুঁজে দেন, তাহলে আমরা উপকৃত হতাম।

মুহতারামের কাছে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন!

হযরত পুরো বইতে 'মানবতা' শব্দটি ব্যাপক ব্যবহার করেছে, ইসলাম মানবতার ধর্ম, ইসলাম মানবতার গ্যারিন্টি দেয়, এমনকি মানবতার জিহাদের নামে একটি শিরোনামও লেখেছেন।

হযরত! বাস্তবতা হলো 'মানববতা' এই শব্দটির আড়ালে রয়েছে পুরো বিশাল এক কুফরি বিশ্বাস, যার উপর আজকের পুরো পশ্চিমা বিশ্বে সকল কুফরি মতবাদ দাঁড়িয়ে আছে, এবং

তারাই এই শব্দটিকে দুনিয়াতে এত বেশি প্রচার করেছেন। সমকালীন বহু মুসলিম পশ্চিমা সভ্যতা গবেষক এই শব্দটির ভয়াবহতা নিয়ে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এর আলোচনা করেছেন। তাদের দাবী হলো ইসলাম মানবতার কথা বলে না, ইসলাম বলে হুকুকুল ইবাদের কথা। এই তো কিছুদিন পূর্বে বর্তমান আলেমদের নিকট বেশ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনি দারুল ফাতহ থেকে প্রকাশিত বই "মাদারিকুত তাকফির" বইটিতেও মুহতারম লেখক ড. ফাদি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন,

إن مسألة حقوق الإنسان ترتبط ارتباطا وثيقا بالرؤية المادية أو الفلسفة الإلحادية المتعلقة بالإله و الإنسان،

নিঃসন্দেহে (প্রচলিত পরিভাষায়) মানবাধিকার (শব্দটি) মানুষ ও প্রভুর ব্যাপারে বস্তুবাদী চিন্তাধারা এবং নাস্তিকতার দর্শনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে। (মাদারিকুত তাকফির পৃ. ৭৩৯)

এছাড়া লেখক আরেকজন গবেষক ড. মুস্তফা বিন হামজার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন,

إن لغة النص الشرعي تتحدث عن حقوق العباد بدل الحديث عن عن حقوق الإنسان، وهو استعمال يجمع بين الإشارة إلى إنسانية الإنسان وما له من حقوق، وبين كونه عبدا لله يجب أن ينضبط لهديه و شريعته.

শরীয়তের নুসূস তথা বক্তব্যসমূহ বান্দার হক (পরিভাষা ব্যবহার করে তা নিয়েই) আলোচনা করে, মানবাধিকার (পরিভাষা ব্যবহার করে তা) নিয়ে আলোচনা করে না। আর শরীয়তের এই ব্যবহারটি খুবই গভীর ও সূক্ষ্মভাবে মানুষের মানুষ হওয়া এবং সেই হিসেবে তার অধিকার সমূহ এবং একইসাথে সে আল্লাহর বান্দা ও দাস হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে আর এই বান্দা ও দাস হওয়ার ভিত্তিতেই সে আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত এবং শরীয়ত মানতে বাধ্য থাকবে। (মাদারিকুত তাকফির পৃ. ৭৫৩)

এছাড়া, পাকিস্তানের ড. জাবেদ আকবর আনসার, যাহেদ সিদ্দিক মোঘল সাহেব ও ইন্ডিয়ার ড. ইয়াসির নাদিম আলওয়াজিদি সাহেবদের এই বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। আশা করি সেগুলো সময় করে একটু মুহতারাম দেখে নিবেন।

আশা করি মুহতারাম বিষয়টা ভেবে দেখবেন, বর্তমান পৃথিবীতে পারিভাষিক ধোকায় মুসলমানরা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত, বিশেষত পশ্চিমা শয়তানের পূজারিরা তাদের সমস্ত কুফরি বিশ্বাসকে এই শব্দের মারপ্যাচে মানুষকে গিলিয়ে যাচ্ছে, লিবারেলিজম, সেকুলারিলিজম, গণতন্ত্র, মানবতাসহ এর সংখ্যা অসংখ্য! এখন আপনার মত ওলামারা যদি সর্বপ্রথম এসকল শব্দ চয়নে সতর্ক না হন তাহলে উম্মাহকে এই সকল শব্দের হাকিকত বুঝানো মুশকিল হবে, এবং এই সকল শব্দের আড়ালে শয়তান ও তার দোসররা মুসলমানদের ঈমান হরন করতে থাকবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের নিজস্ব ব্যবহার করা শব্দ যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, সেগুলোর বিষয়ে কী পরিমান সতর্ক ছিলেন, তার একটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি, মুহতারাম এটা আমার থেকেও ভালো জানেন, শুধুই একটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

মদিনার ইহুদিরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকা শুরু করে "রায়িনা" বলে । শব্দটির দুটো অর্থ হয়, একটা হয় রাখাল আরেকটি হলো 'দেখুন'। ইহুদিরা এই শব্দটি দিয়ে রাসুলকে ডাকতো তাদের উদ্দেশ্য হতো হে আমাদের রাখাল। অনেক ইহুদিদের পাশাপাশি অনেক সাহাবাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে সম্বোধন করা শুরু করলো। সাহাবাদের উদ্দেশ্য ছিলো দ্বিতীয় অর্থ। সাহাবাদের এভাবে ডাকা থেকে ইহুদিরা মজা নিতো। আল্লাহ তখন কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা আমাদের দিকে তাকানোর জন্য 'রায়িনা' এভাবে বলো না, বরং বলো, 'উনজুরু' আমাদের দিকে তাকান এই শব্দে বলো। -সূরা বাকারাহ

সাহাবাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন থাকার পরেও আল্লাহ এভাবে সতর্ক করেছেন। পুরো উম্মাহকে কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই সতর্ক রেখেছেন, শব্দের ব্যাপারে, ইহুদিরা এভাবে শব্দ দিয়ে সন্ত্রাশ করবে, এটা আমাদের ওহির মাধ্যমেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। তখনকার ইহুদিরা যেমন 'রায়িনা' দিয়ে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে, তাদের আজকের উত্তরসূরীরাও এভাবেই মানবতা, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা দিয়ে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে চাইছে। হযরত জানিনা, মনের কথাগুলো বুঝাতে কতটুকু সক্ষম হয়েছি।

মুহতারাম! আপনার দুটো ইবারত ঠিক বুঝিনি।

আপনি ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখেছে, ‘‘পরিষ্কার মু*র*তা*দ, যার কারণে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্য অমুলকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নিরাপত্তা হুমকিতে পড়ে, তার সম্পর্কে ইসলামি আদলতকে রাসূল সাল্লালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যার আদেশ দিয়েছেন।’’

হযরত মুরতাদের শাস্তির সাথে যেগুলো বললেন, এগুলো কী শর্ত হিসেবে বলেছেন নাকি, এমনেই শুধু বলেছেন? এটা এই জন্য জানতে চাওয়া,

১। আমার ক্ষুদ্র মুতালায় যতটুকু জানি, মুরতাদের জন্য শাস্তি শুধুই ইরতিদাদ। এর সাথে আর কোনো শর্ত নেই। সে ইসলাম ত্যাগ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য এটাই আদেশ।

২। বর্তমানে পাকিস্তানের বিখ্যাত মুলহিদ গামেদি, তিউনিসিয়ার বিখ্যাত বিকৃতিকারী গানুষী ও তুরস্কের একদল স্কলার বলেন, ইসলামে মুরতাদের সাধারণ শাস্তি নেই। যদি মুরতাদ হওয়ার পর ইসলামে রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহ করে তাহলে শাস্তি।

আপনার কথাগুলো তাদের পক্ষে দলিল হয়ে যায় কি না, বিষয়টি একটু দেখবেন আশা করি।

মুহতারাম! আপনি ২৫৬ পৃষ্ঠায় দারুল আহদের অনুবাদ করেছেন বন্ধু রাষ্ট্র দিয়ে! আবার দারুল আহদের উদাহরণ দিয়েছেন জাতিসংঘভুক্ত সকল রাষ্ট্রকে! এখন আমার জানার বিষয় হলো, জাতিসংঘের চুক্তিবদ্ধ কাফের রাষ্ট্রগুলো কী আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র? আপনি কিতাবের অন্যত্র লেখেছেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ইসলামে জায়েয নেই। বিষয়গুলো আমি ঠিক বুঝিনি।

হযরত জানিনা আমি কথাগুলো ঠিকমত বুঝাতে পারলাম কি না! আমার শব্দচয়নের ভুলগুলো আশা করি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সামনের পর্বে ইনশাআল্লাহ, ইমাম ছাড়া জিহাদ নিয়ে আপনার দলিল, ফিকহের অবস্থান ও ইতিহাসগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করবো, সাথে আরো যে অস্পষ্ট জায়গাগুলো আছে সেগুলো উল্লেখ করবো। আমার অপারগতা ও শব্দচয়নে কোনো ভুল হলে ক্ষমা করে দিবেন। ও আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে হকের উপর রাখে। আমীন।

দ্বিতীয় পর্ব:

শুরুর আগে...

আপনি যখন কোনো একটি দাবী করলেন, এবং আপনার দাবীটি ভুল সাব্যস্ত হলো, তখন আপনি এ দাবীর পক্ষে যত পৃষ্ঠাই লেখেন সেসবের আর কোনো মূল্য নেই। সেগুলো ধরে ধরে খণ্ডনেরও কোনো প্রয়োজন হয় না, যদি না, নির্দিষ্ট কোনো প্রয়োজন থাকে বা খেয়ানত হয়ে থাকে, বা যুহুল হয়ে থাকে সে বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য হয়। তাই এই দাবী করা যে, বইয়ের প্রতিটি লাইন ধরে ধরে আলোচনা করুন, এটা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

শ্রদ্ধেয় মুহতারাম আবু সাবের আব্দুল্লাহ সাহেবের বইতে জিহাদ বিষয়ে কয়েকটি জোড়ালো দাবী করা হয়েছে, ১. জিহাদ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় একটি আমল। রাষ্ট্রীয় তদারকি ছাড়া কোনো অবস্থায় জিহাদ করা যাবে না। ইকদামি তো নয়ই দিফায়ীও নয়। রাষ্ট্র ছাড়া জিহাদ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অবৈধ।

মুহতারাম লেখক দীর্ঘ আলাপ করার পর শেষে সিদ্ধান্তমূলক লেখেন, **"জিহাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয় একটি বিধান। এরজন্য কোনো এলাকার খলিফা, আমীর বা শাসক শর্ত। খলিফা বা আমীর কর্তৃক ঘোষিত আইনানুগ জেহাদের বাইরে কাউকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।"** পৃ. ৩৩৭

বি.দ্র. লেখক বইতে জিহাদের পাঁচ প্রকার করেছেন। এর মাঝে দিফায়ি ও ইকদামি জিহাদের জন্য রাষ্ট্র ও আরোকিছু শর্ত রয়েছে। বরং যে সমস্ত ঘটনা থেকে জিফায়ি জিহাদে ইমাম বা রাষ্ট্রের কোনো শর্ত নেই সেগুলোকে যুদ্ধের (জিহাদের নয়) অতিরিক্ত দুটো প্রকার করে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছেন। দাফয়ে সায়েল (আতর্কিত হামলার তাৎক্ষনিক প্রতিরোধ) এটা হযরত সালামা ইবনুল আকওয়ার যে জিহাদ ছিলো সে উদারণ লেখক দিয়েছেন। এরপর লেখেন, **"দাফয়ে সায়েল কোনো নিয়মতান্ত্রিক জিহাদ নয়।"** পৃ. ৩০৩, দরবে ইনতেকামী (প্রতিশোধ মূলক প্রত্যাঘাত) এর উদাহরণ দিয়েছেন হযরত আবু বাসীর রা.-এর ঘটনা। এবং এই প্রকার সম্পর্কে লেখেন, **"এটা জিহাদ নয়, ওয়াজিবও নয়, এটা ব্যক্তিগত বিষয়"** পৃ.৩০৬

এখানে কথা প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় বলে নেই, লেখকের পাঁচ প্রকার জিহাদের একটি হলো মানবতা রক্ষার জিহাদ। সে প্রকারের উদাহারণ দিয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম কর্তৃক মক্কা বিজয়। মুহতারাম লেখেন, **"মানবতা রক্ষার জিহাদ... মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত"** পৃ. ৩০৩

মুহতারাম! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মক্কায় মানবতা রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন?!

.

যাইহোক এই হলো লেখকের অবস্থান। আমার অল্প পড়াশোনা মতে জিহাদকে দুপ্রকার হিসেবেই জানি। ১. ইকদামি জিহাদ, ২. দিফায়ি জিহাদ। ইকদামি জিহাদের জন্য অবশ্যই ইমাম বা কেন্দ্রীয় ক্ষমতা লাগবে, তবে এখানেও বহু ফুকাহায়ে কেরাম বিভিন্ন ইখতেলাফ করেছেন। সামনে সংক্ষিপ্ত এই বিষয়ে আলোচনা করবো। তবে দিফায়ী জিহাদের জন্য জিহাদ কোনো অবস্থায় ইমাম, রাষ্ট্র থাকা শর্ত নয়। তখন একটিই শর্ত ধর্তব্য থাকে কুওয়াত, যা পুরো মুজতাহাদ ফিহ, প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী।

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে ইকদামী জিহাদ:

আমাদের ফিকহে যে আলোচনা রয়েছে সেটি রাষ্ট্র কেন্দ্রীক নয়, কারণ 'শাখছে কানূনী' নামক কৃত্রিম বুদ্ধিসম্পন্ন যে রাষ্ট্রের দর্শন, এটা পশ্চিমাদের আবিষ্কার, ইসলামে এর কোনো নজির নেই। (এই বিষয়ে জানতে, মুরাওয়াজা ইসলামি ব্যাংকারি দেখতে পারেন, অথবা জাফর ভাইয়ের প্রকাশিতব্য এটার অনুবাদ দেখতে পারেন।) আলোচনা ইমাম ও শাসক কেন্দ্রীক। তাই প্রাচীন ফিকহের কিতাবের আলোচনা অনুযায়ী মাসআলাটি বুঝতে হবে।

ইকদামি জিহাদ ইমামের অনুমতি ছাড়া করা যাবে কি না, এই বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরামের ইখতেলাফ দেখা যায়। হাম্বলি মাজহাবের ইমামদের মত হলো ইমাম ছাড়া ইকদামি জিহাদ জায়েয নেই। তবে শত্রু আক্রমণ করলে তখন ভিন্ন। ইমাম বাহুতি রহ. (মৃত্যু ১০৫১ হি.) লেখেন,

«ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير) لأنه أعرف بالحرب، وأمره موكول إليه، ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا بإذنه، فالغزو أَولى (إلا أن يفجأهم) أي: يطلع عليهم بغتة »

আমিরের অনুমতি ছাড়া ইকদামি জিহাদ জায়েয হবে না। কেননা তিনি যুদ্ধ বিষয়ে অধিক অবগত এবং এই বিষয়টি তার উপরই ন্যস্ত। মল্লযুদ্ধই যেখানে ইমামের অনুমতি ছাড়া যাওয়া জায়েয নেই, সেখানে ইকদামি জিহাদের ক্ষেত্রে তো আরো মজবুতভাবেই নাজায়েয হবে। হাঁ, তবে যদি শত্রুপক্ষ মুসলিমদের উপর অতর্কিত হামলা করে (তাহলে ইমামের অনুমতি ছাড়াই জায়েজ হবে)। (কাশফুল কিনা ৭/১১৭)

ইমাম ছাড়া ইকদামী জিহাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন শাফেয়ী ফুকাহাগণ। ইমাম শাফেয়ী থেকে নিয়ে ইমাম নববী ও আরো নীচের দিকের ইমামগণ। তাদের মত হলো ইমাম ছাড়া জিহাদ মাকরুহ, তবে কোনো অবস্থায় হারাম নয়। তবে কিছু কারণ পাওয়া গেলে এই মাকরুহও থাকবে না। নিম্নে ইবারতগুলো দেখেন। (এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, শাফেয়ী আলেমগণ যখন মুতলাকভাবে মাকরুহ শব্দ বলেন তখন তার দ্বারা উদ্দেশ্য মাকরুহে তানজিহি। দেখুন, ফিকহুল বুয়ু ১/৩৩৮, মুফতি তাকী উসমানী দা.বা.

ইমাম মুজানী রহ. (মৃত্যু ২৬৪ হি.) বলেন,

«وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته لما في إذن الإمام من معرفته بغزوهم ومعرفتهم ويأتيه الخبر عنهم فيعينهم حيث يخاف هلاكهم فيقتلون ضيعة. (قال الشافعي) : - رحمه الله – ولا أعلم ذلك يحرم عليهم»

যদি কোনো দল ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদে বের হয় তাহলে আমি তা মাকরুহ মনে করি। কেননা ইমাম জিহাদের ব্যাপারে ভাল জানবেন, এবং মুজাহিদদের খবর তার কাছে আসবে এবং তিনি সে হিসেবে সাহায্য করতে পারবেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আমি জানিনা ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদকে কেউ হারাম বলেছেন। (মুখতাসারুল মুজানি ৮/৩৭৯)

ইমাম নববি রহ. (মৃত্যু ৬৭৬ হি.) লেখেন,

«يكره الغزو بغير إذن الإمام أو الأمير المنصوب من جهته، ولا يحرم»

ইমাম অথবা তার পক্ষ থেকে জিহাদের কাজে নিয়োজিত আমিরের অনুমতি ছাড়া ইকদামি জিহাদ করা মাকরুহ হবে, তবে তা হারাম হবে না। (রওযাতুত তালিবিন ১০/২৩৭)

তবে এই মাকরুহে তানজিহির কারণ কী, সে সম্পর্কে শাফেয়ী ফকিহ খতিব আশ শিরবিনী রহ. (মৃত্যু ৯৭৭ হি.) বলেন,

(يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) تأدبا معه، ولأنه أعرف من غيره بمصالح الجهاد، وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهاد. وينبغي كما قال: الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة أما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك؛ لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام، فهم بمنزلة الأجراء.

(ইমাম বা তার নায়েবের অনুমতি ব্যতিত ইকদামি জিহাদ করা মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় হবে) তার সাথে আদব ও সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে। কেননা, তিনি অন্য সবার থেকে জিহাদের কল্যাণকর বিষয়গুলো বেশি জানেন। তবে ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করলে তা হারাম এজন্য হবে না যেহেতু এতে বেশি থেকে বেশি নিজের জীবনকে ক্ষতির মুখে ফেলা হয়। আর তা তো জিহাদে জায়েযই। তবে এই হারাম না হওয়ার ব্যাপারটিতে ইমাম আযরুয়ীর মতো 'সেচ্ছায় জিহাদে অংশগ্রহণকারী' এই শর্তটি যুক্ত করে দেওয়া উচিত ছিলো। কেননা, সরকারি বেতনভুক্ত বাহিনীর জন্য ইমামের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা নাজায়েয হবে। (অন্যদের জন্য নয়।)...। (মুগনীল মুহতাজ ৬/২৪)

ইমাম বুলকিনি রহ. (মৃত্যু ৮০৫ হি.) তিন অবস্থায় ইকদামি জিহাদের ক্ষেত্রেও ইমামের অনুমতি না নিলে মাকরুহও (অপছন্দনীয়ও) হবে না বলে মত পেশ করেন। তিনি বলেন,

يكره الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه إلا إذا كان من يريد الغزو لو ذهب إلى الاستئذان فاته المقصود، وإلا إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنده على أمور الدنيا وغير ذلك، وإلا إذا كان من يريد الغزو لا يقدر على الاستئذان ويغلب على ظنه أنه لو استأذن لم يؤذن له فلا كراهة في هذه الصور

অর্থাৎ, ইমামের বা তার নায়েবের অনুমতি ছাড়া ইকদামি জিহাদ করা মাকরুহে (তানযীহী বা অপছন্দনীয়)। তবে কয়েক সূরতে মাকরুহে (তানযীহী)ও হবে না। এক. ইমামের অনুমতি আনতে গেলে কাফেরদের উপর আক্রমণের যে উদ্দেশ্য তা ছুটে যাবে। দুই. ইমাম ও তার সেনাবাহিনী জিহাদকে অকার্যকর করে রেখে দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তিন. অনুমতি নিতে পারছে না এবং প্রবল ধারণা হয় যে, ইমামের নিকট অনুমতির জন্য গেলে ইমাম জিহাদের অনুমতি দিবে না। এসকল সুরতে ইমামের অনুমতি না নিলে মাকরুহে (তানযীহীও) হবে না! (তাদরিবুল মুবতাদি ৪/২১৫)

শাফেয়ী মাজহাবের একজন ফকিহ রমলী রহ. (মৃত্যু ১০০৪ হি.) ইমাম বুলকিনির এই কথার উপর আরেকটি শর্ত যুক্ত করেন—'যদি ফিতনার আশংকা না থাকে'। তিনি লেখেন,

(يكره غزو) وهو في اللغة الطلب إذ الغازي يطلب إعلاء كلمة الله تعالى (بغير إذن الإمام أو نائبه) إذ كل منهما أعرف بالحاجة الداعية إليه، وإنما لم يحرم لجواز التغرير بالنفس في الجهاد، وبحث الزركشي وغيره أنه ليس لمرتزق استقلال به؛ لأنه بمنزلة أجير لغرض مهم يرسل إليه، وأنه لا كراهة إن فوت الاستئذان المقصود أو عطل الإمام الغزو، أو غلب على ظنه عدم الإذن له كما بحث ذلك البلقيني، نعم يتجه تقييد ذلك بما لم يخش منه فتنة

অর্থাৎ, ইমাম বা তার নায়েবের অনুমতি ছাড়া ইকদামি জিহাদ করা মাকরুহে (তানযীহী) হবে। কেননা, জিহাদের বাস্তব প্রয়োজন ও কার্যকারণের ব্যাপারে ইমাম ও নায়েবে ইমামই অধিক অবগত। তবে তা হারাম (নাজায়েজ/মাকরুহে তাহরীমী) হবে না। কেননা, জিহাদের ক্ষেত্রে নিজেকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেওয়া জায়েজ আছে। ইমাম যারকাশি রহ.সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছে যে, বেতনভুক্ত সৈনিকের জন্য জন্য ইমামের অনুমতি ছাড়া (স্বাভাবিক অবস্থায়) আলাদাভাবে জিহাদ করা জায়েয নেই (মাকরুহে তাহরীমী)। কারণ, সে হলো এমন বিশেষ আজীর তথা শ্রমিক বা কর্মচারীর মতো যাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

আর ইমামের অনুমতি নিলে কোনো ধরণের কারাহাতও থাকবে না (অর্থাৎ মাকরুহে তানযীহী না হয়ে সম্পূর্ণরূপে জায়েজ হবে) যদি ইমামের অনুমতি নিতে গেলে মূল উদ্দেশ্য ছুটে যায়, অথবা ইমাম জিহাদকে অকার্যকর করে রাখে কিংবা যদি প্রবল ধারণা হয় যে অনুমতি চাইতে গেলে ইমাম অনুমতি দিবেন না। যেমনটা ইমাম বুলকীনী উল্লেখ করেছেন। তবে এক্ষেত্রে একটি শর্ত যুক্ত করতে হবে—এমনটা করলে কোনো ফিতনার আশঙ্কা না থাকতে হবে। (নিহায়াতুল মুহতাজ ৮/৬০)

মালেকি ও হানাফিদের থেকে আমি এই বিষয়ে তেমন সরিহ জুযইয়্যাহ পাইনি। তবে বিভিন্ন জুযয়ী মাসআলা থেকে বিভিন্ন ধরনের বিষয় বুঝে আসে, এখানে এত বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এই তো এমন একটি সূরত হলো, যখন ইমাম নিজে উপস্থিত আছেন তখন তার অনুমতি ছাড়া ইকদামি জিহাদ। আর যদি মুসলিম উম্মাহের মাঝে কখনো ইমাম না থাকে,

অথবা ইমাম মারা যায় কিন্তু জিহাদের কাজ চালিয়ে যেতে হয় এমন পরিবেশ হয় তখন কী করা হবে?

মুসলমানদের মাঝে ইমাম থাকবে না, এমন তাসাওউরও তো বহু ইমামের জন্য সম্ভব ছিলো না, কিন্তু আল্লাহ আমাদের ফুকাহায়ে কেরামকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তারা এমন কিছু জুযয়ী মাসআয়েল কুরআন সুন্নাহের আলোকে লেখে গেছেন, যা দিয়ে সর্ব সমস্যা সমাধান সম্ভব।

ইমাম ইবনে কুদামা রহ. লেখেন,

فإن عدم الإمام، لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره. وإن حصلت غنيمة، قسمها أهلها على موجب الشرع. قال القاضي: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطا للفروج»

অর্থাৎ, ইমামের হাতেই জিহাদের কাজ ন্যস্ত। তিনি সঠিকভাবে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিবেন। সেনাদেরকে জিহাদের ময়দানে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিবে না। যদি এমনটি করে তাহলে গুনাহগার হবে, তবে এই জন্য তার উপর কাফফারা আসবে না। তবে যদি এমন হয় ইমাম নেই। তাহলে এমন অবস্থায় জিহাদের কাজকে দেরি করাবে না। এবং জিহাদের কাজ চালিয়ে যাবে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ শরয়ী পদ্ধতিতে নিজেদের মাঝে বন্টন করে নিবে। (আল মুগনী ১২/৪৩১)

বাহুতি (মৃত্যু: ১০৫১হি.) রহ.ও এই বিষয়ে এমন সমাধানই দিয়েছেন। তিনি বলেন,

(فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد) لئلا يستولي العدو على المسلمين وتظهر كلمة الكفر (وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع) كما يقسمها الإمام، على ما يأتي بيانه في باب قسمة الغنيمة قال القاضي (وتؤخر قسمة الإماء حتى يقوم إمام) ، فيقسمها (احتياطا) للفروج.

(ইমামের অনুপস্থিতে জিহাদের কাজে দেরি করবে না) যাতে (কাফেররা আগে বেড়ে আক্রমণ করে) মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে না পারে এবং (যদি গনিমত অর্জন হুঅয় তাহলে শরয়ী নিয়মনুযায়ী বন্টন করে নিবে) যেমনটি ইমাম বিদ্যমান থাকলে করতেন। (কাশশাফুল কিনা ৩/৪১)

ইমাম জুয়াইনি রহ. এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন যে, কখনো যদি মুসলিম উম্মাহ ইমাম শূন্য হয়ে যায় তখন কিভাবে দ্বীনি বিষয়ে মানুষ নিজেদের মাঝে সমাধান করবে।

তিনি সেখানে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ইমাম না থাকা অবস্থায় ইকদামি জিহাদ করাকে বৈধ বলেছেন। এবং পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক শক্তিশালী কারো নেতৃত্বে জিহাদের কাজ আদায় করে নিবে। তিনি লেখেন,

فإذا شغر الزمان عن كاف مستقل بقوة ومنة، فكيف تجري قضايا الولايات، وقد بلغ تعذرها منتهى الغايات. فنقول: أما ما يسوغ استقلال الناس فيه بأنفسهم ولكن الأدب يقتضي فيه مطالعة ذوي الأمر، ومراجعة مرموق العصر، كعقد الجمع، وجر العساكر إلى الجهاد، واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه الناس عند خلو الدهر.

যদি এমন যামানা আসে, যখন শক্তি ও সক্ষমতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ যোগ্য কোন ইমাম নেই, তাহলে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কিভাবে পরিচালিত হবে; যখন তা অক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে? (এর সমাধানে) বলবো, সেসব বিষয়ে জনগণ নিজেরাই আদায় করে নেয়ার বৈধতা আছে, তবে আদব হল দায়িত্বশীল ও বিশিষ্টজনদের অবহিত করা এবং তাদের নির্দেশনা সাপেক্ষে করা; যেমন: জুমআ কায়েম, জিহাদের জন্য বাহিনী প্রেরণ, হত্যা বা যখমের কেসাম নেয়া—ইমাম না থাকা অবস্থায় জনগণ নিজেরাই সেগুলো আঞ্জাম দিবে। (গিয়াসুল উমাম পৃ. ৭৯)

আর ফুকাহায়ে কেরাম তো জিহাদের মাসআলাকে এতটাই গুরত্ব দিয়েছেন যে, ইমাম যদি ফাসেক হয়, ইমাম যদি জিহাদের কাজে টালমাটাল করে বা জিহাদের মুদাহানাতের পরিচয় দেয় তাহলে মুসলমানরা নিজেরাই এই ফরজ কাজ আঞ্জাম দিবে। ইমাম ওয়াকি ইবনুর জাররাহ রহ.-এর মতে জালেম ইমাম যদি নিজে জিহাদ না করে এবং জিহাদের কাজে উল্টো বাঁধা দেয় তাহলে জিহাদের জন্য তার অনুমতির প্রয়োজন নেই। বরং প্রত্যেকেই নিজের সাধ্যের মধ্যে থেকে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিবে।

«وحدث أحمد بن ثعلبة قال:سئل وكيع بن الجراح عن قتال العدو مع الإمام الجائر قال: إن كان جائرا وهو يعمل في الغزو بما يحق عليه فقاتل معه. وإن كان يرتشي منهم ويهادنهم فقاتل على حيالك». (تاريخ دمشق ٤٧/٧١، تحت ترجمة : أحمد بن ثعلبة العاملي: برقم: ٩٥٦٦، دار الفكر ١٤١٥ ه)

ইমাম ওয়াকি রহ.কে জালেম ইমামের সাথে জিহাদের বিধান জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ইমাম যদি জালেম হয় আর সে জিহাদের কাজ আঞ্জাম দেয় যথাযথ তাহলে তার অনুগত থেকেই জিহাদ করতে হবে। আর সে যদি টালমাটাল করে, বা জিহাদের বিষয়ে শৈথল্যের

(মুদাহানাতের) পরিচয় দেয় তাহলে তুমি তোমার কৌশলনুযায়ী জিহাদ চালিয়ে যাও। (তারিখে দিমাশক ৭১/৪৭)

এই হলো ফুকাহায়ে কেরামের ইকদামি জিহাদের নজরিয়্যাহ! অথচ মুহতারাম লেখকের পুরো বইটি পড়লে মনে হবে, ইমাম/রাষ্ট্র ছাড়া জিহাদ একটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড!

যাইহোক, এবার আসি **দিফায়ী জিহাদের আলোচনা:**

ইকদামী জিহাদে এই ইখতেলাফ থাকলেও দিফায়ী জিহাদের মাসআলায় এই নিয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই, সকলেই প্রায় একমত প্রত্যেক মুমিনের তার সামার্থনুযায়ী প্রতিরোধ করতে হবে। কারন এটাই আল্লাহর আদেশ, ইমামা শাফেয়ী রহ.র চমৎকার বক্তব্যটি দেখুন,

وأن أهل حصن من المسلمين لو جاءهم العدو فحاربوهم بغير إذن الإمام كانوا سراقا وليس هؤلاء بسراق بل هؤلاء المطيعون لله المجاهدون في سبيل الله المؤدون ما افترض عليهم من النفير والجهاد»

যদি কোনো দূর্গে শত্রুরা আক্রমণ করে আর সেখানের মুসলমানরা ইমামের অনুমতি ছাড়াই তাদের সাথে জিহাদ করে তাহলে তারা আল্লাহর আদেশ পালন করলো। তারা হলো আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ। তাদের উপর আল্লাহ যে ফরজ বিধান আরোপ করেছেন অগ্রাসী শত্রুর মোকাবেলায় তা তারা আদায় করেছে। (আল উম্ম ৭/৩৭৩)

ইমাম মুহাম্মদ রহ. তো এই পর্যন্ত বলেছেন যদি শত্রু আক্রমণ করে তাহলে প্রতিরোধ করতে যদি ইমাম নিষেধ করে তাহলে তার আদেশ মানা জরুরি না, বরং তার সেই আদেশ হবে গুনাহের আদেশ।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. (মৃত্যু : ১৮৫ হি.) বলেন,

وإن نهى الإمام الناس عن الغزو والخروج للقتال فليس ينبغي لهم أن يعصوه إلا أن يكون النفير عاما.

ইমাম যদি ইকদামি জিহাদের জন্য বের হতে স্পষ্ট নিষেধ করে তাহলে তাদের জন্য ইমামের এই আদেশের অমান্য করা ঠিক হবে না। তবে জিহাদ যদি নফিরে আম তথা ফরজে আইন হয়ে যায় তখন অমান্য করলে কোনো সমস্যা নেই।

‘ইমামের আনুগত্য কেন এখানে আবশ্যক নয়’ এর কারণ হিসেবে ইমাম সারাখসী রহ. (মৃত্যু ৪৮৩ হি.) লেখেন,

لأن طاعة الأمير فيما ليس فيه ارتكاب المعصية واجب، كطاعة السيد على عبده فكما أن هناك بعد نهي المولى لا يخرج إلا إذا كان النفير عاما فكذلك ها هنا. والله أعلم. (شرح السير الكبير ٣٧٨/٢، باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك)

মাসিয়াত বা গুনাহের কাজে ইমামের অনুগত্য নেই। এখানেও জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার পর তা আঞ্জাম দিতে নিষেধ করা মূলত মাসিয়াতের আদেশ, যেখানে ইমামের অনুগত্য করা যাবে না। (শরহুস সিয়ার ২/৩৭৮)

শত্রু যদি মুসলিম ভুখণ্ডের পাশেও চলে আসে তখন মুসলমানদের জন্য ইমামের অনুমতি ছাড়া আগে বেড়ে দিফা করা যাবে। ইমাম মালেক রহ.-এর মত এটি।

হাত্তাব আল উরাইনী রহ. (মৃত্যু ৯৫৪ হি.) বলেন,

«وسئل مالك عن العدو ينزل بساحل من سواحل المسلمين يقاتلونهم بغير استئمار الوالي؟ فقال: أرى إن كان الوالي قريبا منهم أن يستأذنوه في قتالهم قبل أن يقاتلوهم، وإن كان بعيدا لم يتركوهم حتى يقعوا بهم، فقيل له: بل الوالي بعيد منهم. فقال: كيف يصنعون أيدعوهم حتى يقعوا بهم أرى أن يقاتلوهم» (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٣/ ٣٤٩، مسألة أيغزو بغير إذن الإمام)

‘মালেক রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, শত্রু যদি কোনো মুসলিম ভুখণ্ডের নিকটে এসে অবস্থান নেয় তাদের সাথে আমিরের অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা যাবে? তিনি উত্তরে বললেন, “আমার মত হলো যদি আমির নিকটে থাকে তাহলে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তার অনুমতি নিয়ে নিবে। আর দূরে থাকলে কাফেরদের আগে আক্রমণ করার সুযোগ না দিয়ে মুসলমানরা আক্রমণ করে দিবে”। বলা হলো, আমির মুসলিম সেনাদের থেকে দূরে। মালেক রহ. বললেন, “তারা কী করবে! কাফেরদের সুযোগ করে দিবে তাদের উপর আগেবেড়ে আক্রমণ করতে!! আমার মত হলো মুসলিমরা তখন অনুমতি ছাড়াই আগেবেড়েই কাফেরদের উপর আক্রমণ করবে”।’ (মাওয়াহিবুল জালিল ৩/৩৪৯)

দিফায়ী মাসআলার গুরত্ব তো এত বেশি যে, ঐ সময় জিহাদের ছোটখাটো মাসআলা নিয়ে ইখতিলাফকে ইমামগণ অপছন্দ করেছেন। ইবনে মুফলিহ রহ. (মৃত্যু ৭৬৩ হি.) লেখেন,

«ونقل المروذي: يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير، وسأله أبو داود: بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزي بأهلها، يغزو معهم؟ قال: نعم، قلت: يشتري من سبيه؟ قال: دع هذه المسألة: الغزو ليس مثل شراء السبي، الغزو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء، فيتوجه في سبيه كمن غزا بلا إذن» (الفروع وتصحيح الفروع» ١٠/ ٢٢٧، كتاب الجهاد، مدخل)

‘মাররুজি রহ. (ইমাম আহমদ রহ.-এর খাস শাগরেদ) নকল করেন, “যখন দিফায়ী জিহাদের ডাক এসে যায় (অর্থাৎ, কোনো মুসলিম ভুখণ্ডে কাফেররা আক্রমণ করে বসে বা করার জন্য ধমকি দেয়) তখন ইমাম ছাড়াই প্রত্যেকের উপর জিহাদ আবশ্যক হয়ে যায়”। আবু দাউদ রহ. ইমাম আহমদ রহ.কে জিজ্ঞাসা করেছেন, “কোনো শত্রু যদি কোনো ভূখণ্ডে আক্রমণ করে আর সে ভুখণ্ডের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা শুরু করে, তাহলে আমরা কি তাদের সাথে মিলে জিহাদ করবো”? তিনি উত্তর দিলেন, “হাঁ”। আমি (আবু দাউদ) জিজ্ঞাসা করলাম, “সেখানের বন্দিদের কি আমরা ক্রয় করতে পারবো”? আহমদ রহ. উত্তর দিলেন, “আরে এইসকল মাসআলা ছাড়ো। এই যুদ্ধ বন্দি ক্রয়-বিক্রয়ের মত না। (অর্থাৎ এই অবস্থায় এই সকল ইখতিলাফি মাসআলা আলোচনার সময় না) এই যুদ্ধ হলো মুসলিমদের পক্ষ থেকে শত্রুকে প্রতিরোধ করা। যা কোনো অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না। (আল ফুরু ওয়া তাসহিহুল ফুরু ১০/২২৭)

ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর ইবারত নিম্নরূপ,

«مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» (ص٣١٦):
«١٥٠٨ - قلت لأحمد " بلاد غلب عليها رجل فنزل والبلاد يغزو بأهلها، نغزو معهم؟ قال: نعم. قلت: نشتري من سبيه؟ قال: دع هذه المسألة، ثم قال: الغزو ليس مثل شراء السبي، الغزو إنما هو دفع عن المسلمين، لا يترك لشيء "»

এই হলো আমাদের ইমামদের ইমাম/শাসক ছাড়া জিহাদের মাওকিফ। ফুকাহায়ে কেরামের এই মাওকিফ স্পষ্ট হওয়ার পর আলাদাভাবে মুহতারাম লেখকের বক্তব্যের খণ্ডণ আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বাকি লেখক যেহেতু সেখানে অনেকগুলো দলিল দিয়েছেন, এবং ইতিহাসের কিছু ঘটনা টেনেছেন, তাই সেগুলোর বাস্তবতা একটু আলোচনাকে জরুরি মনে করছি। বিশেষত লেখক ইতিহাস অংশে যা লেখেছেন সেটা লেখকের ইতিহাসের **ভুল**

মূল্যায়ণ ছাড়া আর অন্যকোনো শব্দ বলা মুনাসিব মনে করছি না। বাকি আজকের লেখা বড় হয়ে গেছে। এখানেই সমাপ্ত দেই, আগামী পর্বে লেখকের দলিল ও ইতিহাসের আলোকে, ভুখণ্ড, শাসক ছাড়া আমাদের সালাফদের জিহাদের নমুনা দেখবো ইনশাআল্লাহ।

তৃতীয় পর্ব

মুহতারাম লেখকের দাবী ছিলো, রাষ্ট্র ছাড়া জিহাদ করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এক্ষেত্রে ইকদামি বা দিফায়ীর কোনো পার্থক্য নেই। আগের পর্বে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের আলোকে আমরা দেখেছিলাম, লেখকের এমন দাবী সহিহ নয়, মুহতারাম লেখক থেকে এখানে জাল্লাত হয়েছে। এই পর্বে মুহতারাম লেখকের দাবীর পক্ষে দলিলগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করবো। এবং শেষে লেখক যে সকল শর্ত দিয়েছেন জিহাদের জন্য সেগুলোর আলোকে ইতিহাসের কিছু জিহাদ দেখিয়েছেন—এগুলো এই শর্তে উত্তীর্ণ। কিন্তু আমাদের অল্প পড়াশোনা মতে লেখক এখানে অনেক বেশি পরিমান জুহুলের স্বীকার হয়েছেন। ঘটনার পুরো ভুল মূল্যায়ন করেছেন।

প্রথম দলিল : হযরত তার প্রায় পুরো বই জুড়ে একটি দাবী বারবার করেছেন যে, ‘‘মক্কায় যেহেতু জিহাদ আবশ্যক হয়নি, তাই এটা থেকে বুঝা গেলো জিহাদের জন্য রাষ্ট্র শর্ত!’’

মুহতারাম! এটাকে কেন যে এত বড় দলিল হিসেবে বারবার পেশ করলেন তা আমাদের বোধগম্য না! এটা কী আসলে দলিল হওয়ার উপযুক্ত? কোনো ফকিহ এটাকে জিহাদ শর্তের জন্য দলিল হিসেবে পেশ করেছেন? এবং দিফায়ী জিহাদের মাঝে? এই বিষয়ে বেশি কিছু বলার ইচ্ছে নেই, শুধু দেওবন্দি আলেম ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেবের কথাটুকুই এখানে বলি, **‘‘জিহাদের জন্য রাষ্ট্র শর্ত এটার ভিত্তি যদি হয় মক্কায় কেন তা অবতীর্ণ হয়নি তাহলে আরো অসংখ্য বিধানের ক্ষেত্রে—রোজা, যাকাত, মিরাছ ইত্যাদি—একই কথা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কি কেউ বলেছে এই বিধানগুলোর জন্য রাষ্ট্র শর্ত? অবশ্যই বলেনি! তাহলে জিহাদের ক্ষেত্রে কেন এই শর্ত যুক্ত করে দেওয়া হবে? বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে দিফায়ি জিহাদ যেখানের উদ্দেশ্যই হলো ইসলামি খেলাফতের পূনরুদ্ধার, সেখানে এখন**

জিহাদের জন্যই যদি রাষ্ট্র শর্ত করে দেওয়া হয় তাহলে তো দাওর লাজেম আসে, যা সম্পূর্ণ বাতিল! (জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ আউর এতেরাজ কা ইলমি জায়েযা পৃ. ১৯২ কিছুটা সংক্ষেপিত)

এরপর ইলিয়াস ঘুম্মান সাহেব জিহাদের জন্য রাষ্ট্রের শর্তের দাবীর খণ্ডনে আবু বাসির রা.-এর দলিল পেশ করেন! যাকে শ্রদ্ধেয় লেখক জিহাদ বলতেই নারাজ!

দ্বিতীয় দলিল :

এরপর লেখক তার দাবীর পক্ষে দুটো হাদিস একসাথে পেশ করেছেন, অন্যস্থানে আরেকটি; মোট তিনটি হাদিস নিয়ে আসেন।

আমাদের কথা হলো, তিনটি হাদিসের একটিও লেখকের পক্ষে দলিল হয় না। বরং দুটো তো স্পষ্ট লেখকের বিপক্ষেই যায়! সে দুটো নিয়েই একটু আলোচনা করি।

প্রথম হাদিস: মুহতারম লেখক 'জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত' এই দাবীর পক্ষে প্রথম যে হাদিসটি পেশ করেছেন তার পূর্ণ পাঠ হলো,

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم، برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر". (رواه أبو داود في "سننه" باب في الغزو مع أئمة الجور، برقم: ٢٥٣٣، تـ شعيب الأرناؤوط. قال البيهقي في "المعرفة" (٤/٢٢٤، برقم:٥٩١٩): وهذا إسناد صحيح، إلا أن فيه إرسالا بين مكحول وأبي هريرة. كما في نصب الراية ٢/٢٧، (تـ محمد عوامة، طـ الأولى ١٤١٨هـ)

হযরত আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর জিহাদ আবশ্যক প্রত্যেক আমিরের সাথেই, চাই তিনি নেককার হোক বা ফাসেক। প্রত্যেক মুসলিমের পিছনেই তোমাদের উপর নামাজ আবশ্যক, চাই সে নেককার হোক বা ফাসেক। প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামাজ আবশ্যক চাই সে নেককার হোক বা ফাসেক। এমনকি যদিও সে কবিরাহ গুনাহগারী হোক না কেন। (সুনানে আবু দাউদ : ২৫৩৩)

এই হাদিস থেকে যে সিদ্ধান্তে উনি পৌঁছেছেন 'জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত' এখানে আমাদের দ্বীমত আছে। এবং কয়েকটি কারণে এই ইসতিদলালকে সহিহ মনে করি না।

১. এই হাদিসকে সামনে রেখে মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম অসংখ্য মাসআলা ইসতিনবাত করেছেন। এমনকি এই হাদিসটি দিয়ে অনেক আকিদার ইমাম আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা 'ফাসেক ইমামের সাথে জিহাদের ফরজিয়্যাতের' মাসআলা আকিদার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জিহাদের মত একটি ফরজ বিধান যা উম্মাহের লক্ষ্য লক্ষ্য ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত, যার ফরজিয়্যাত ও শর্তসমূহের খুটিনাটি প্রতিটি বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন, তথাপি কোথাও এই হাদিস দিয়ে এ মাসআলা বলেননি যে, জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত।

২. হাদিসের পরের অংশে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, " والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا" (তোমাদের উপর নামাজ আবশ্যক প্রত্যেক মুসলিমের পিছনে চাই সে নেককার হোক বা ফাসেক) যদি প্রথম অংশ থেকে জিহাদ সহিহ হওয়ার জন্য ইমাম শর্ত প্রমাণ হয়, তাহলে একই হাদিসের একই শব্দের দ্বিতীয় অংশ থেকেও এই কথা প্রমাণ হওয়া আবশ্যক হবে যে, নামাজ সহিহ হওয়ার জন্য ইমামের পিছনে জামাতে আদায় করা শর্ত! অথচ এমন কথা কেউ বলেনি আজ পর্যন্ত। বরং এখানে আলোচ্য বিষয়টি হলো ইমাম যদি ফাসেকও হয় তাহলেও তার পিছনে জামাতে নামাজ আদায় করতে হবে। শুধু ইমামের ফিসকের কারণে জামাতে নামাজ আদায় করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।

৩. মূলত এই হাদিসের প্রক্ষাপট হলো মানুষের মনের এই সংশয় দূর করা ও একদল মুনাফিকের জিহাদ বিমুখতার জবাব দেওয়া যে, জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এতই বেশি যে, ইমাম ব্যক্তিগতভাবে ফাসেক হলেও সে যখন জিহাদের ডাক দিবে তখন মুসলমানদের উপর সেই ইমামের অধীনে জিহাদে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। আমাদের ক্ষুদ্র অনুসন্ধানে মুহাদ্দিস ও ফুকাহাদের থেকে এমন ব্যাখ্যাই পেয়েছি। এই হাদিসকে সামনে রেখে মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক।

বাহাউদ্দিন মাকদেসি রহ. (মৃত্যু ৬২৪ হি.) লেখেন,

مسألة ٥: (ويغزا مع كل بر وفاجر) يعني مع كل إمام، لما روى أبو داود بإسناده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا» ؛ ولأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى

قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم وإظهار كلمة الكفر وفيه أعظم الفساد. (العدة شرح العمدة ٦٢٣، كتاب الجهاد، دار الحديث، القاهرة ١٤٢٤هـ)

‘হাদিসে বর্ণিত ‘তোমাদের উপর জিহাদ আবশ্যক প্রত্যেক নেককার ও ফাসেক ইমামের সাথেই’ কেননা ফাসেকের সাথে জিহাদ ছেড়ে দিলে জিহাদ বন্ধ হয়ে যাবে। কাফেররা এতে বিজয় হবে এবং মুসলিমদের উপর তাদের কুফরি চাপিয়ে দিবে। আর তাতে রয়েছে অনেক বড় ফাসাদ।’ (আল উদ্দাহ শরহুল উমদাহ পৃ. ৬২৩)

বদরুদ্দিন আইনী রহ. (মৃত্যু ৮৫৫ হি.) লেখেন,

«وقد علم أن في أمته أئمة جور لا يعدلون ويستأثرون بالمغانم، ومع هذا فقد أوجب الجهاد معهم». (عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٤/ ١٤٥، باب الجهاد ماض على البر والفاجر، دار إحياء التراث العربي – بيروت)

‘এই হাদিস থেকে বুঝা গেলো এই উম্মতের মাঝে জালেম শাসক আসবে যারা ইনসাফ করবে না। এবং গনিমতের মাঝে সঠিক বণ্টন করবে না। এতদা সত্ত্বেও তাদের সাথে জিহাদ আবশ্যক (যদি তারা জিহাদের আহবান করে)।’ (উমদাতুল কারী ১৪/১৪৫)

ফকিহ ইবনু কুদামা আল মাকদেসি রহ. (মৃত্যু ৬২০ হি.) লেখেন,

«الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا.» رواه أبو داود؛ ولأن تركه مع الفاجر يُفضي إلى تعطيل الجهاد وظهور العدو.وقال أحمد: لا يعجبني أن يخرج مع القائد إذا عرف بالهزيمة، وتضييع المسلمين، فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر، والغلول، يغزى معه إذا كان له شفقة وحيطة على المسلمين. إنما فجوره على نفسه، ويروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» متفق عليه. (الكافي في فقه الإمام أحمد٤/ ١٣٤، كتاب الجهاد، باب ما يلزم الجيش من طاعة الإمام، دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ)

‘‘জিহাদ প্রত্যেক আমিরের সাথে আবশ্যক চাই সে নেককার হোক বা ফাসেক’ (আবু দাউদ রহ. হাদিসটি রেওয়ায়েত করেন) কেননা ফাসেকের সাথে জিহাদ ছেড়ে দিলে জিহাদের বিধানটি অকার্যকর হয়ে যাবে এবং শত্রুরা বিজয়ী হয়ে যাবে।...।’ (আল কাফি ৪/১৩৪)

মোটকথা, ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসগণের নিকট এই হাদিস মারুফ ও মাশহুর ছিলো। তাঁরা এই হাদিস থেকে বিভিন্ন মাসআলাও বলেছেন কিন্তু এই নতিজায় পৌঁছেননি যে, ‘জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত’। তাই বিষয়গুলো সামনে রেখে ও পূর্বের অধ্যায়ের আলোচনা থেকে এবং আমার ক্ষুদ্র নজরে এই হাদিসের যে কয়টি ব্যাখ্যাগ্রন্থে দেখার তাওফিক হয়েছে

সব সামনে রেখে এই কথা বলতে পারি মুহতারাম লেখকের ‘জিহাদের জন্য ইমাম বা রাষ্ট্র শর্ত’ এই সংক্রান্ত আলোচনায় এই হাদিস দিয়ে ইসতেদলাল সহিহ হয়নি।

দ্বিতীয় হাদিস:

দ্বিতীয় যে হাদিসটি দিয়ে মুহতারাম লেখক দলিল দিয়েছেন তা সহিহ বুখারীসহ হাদিসের বহু কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। সহিহ বুখারী ৩৬০৬ নং হাদিসের পূর্ণ পাঠ হলো,

عن حذيفة بن اليمان قال «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، : يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.». (صحيح البخاري رقم: ٣٦٠٦، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام)

মুহতারাম লেখক, এই হাদিসকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে এই মত ব্যক্ত করেন যে, যদি কখনো মুসলিমদের মধ্যে ইমাম না থাকে তখন আর মুসলিমদের উপর জিহাদ আবশ্যক হবে না। যতক্ষণ ইমাম নিয়োগ না হবে। বরং হাদিসের ভাষ্য "فاعتزل تلك الفرق كلها" (ঐ সকল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও)-এর আদেশসূচক (আমর) এর অর্থ হলো জিহাদ করা যাবে না!

এই হাদিস থেকে যে নতিজা বের করেছেন এই বিষয়ের সাথে আমরা একমত নই। এবং এই হাদিস থেকে এভাবে দলিল দেওয়াকে সহিহ মনে করি না। তার কারণ হলো,

১. প্রথম হাদিসের ক্ষেত্রে আমাদের যে অবস্থান এই হাদিসের ক্ষেত্রেও একই অবস্থান। অর্থাৎ, উম্মাহর মুজতাহিদ ফকিহগণ জিহাদের জন্য ইমামের শর্ত, এমনকি ইমাম না থাকলে জিহাদের কাজ বন্ধ রাখতে হবে, এমন কথা কেউ বলেননি। বরং সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য ইমাম জুয়াইনিসহ বেশ কিছু ফকিহ থেকে আমরা দেখেছি।

২. ‘সবদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও’ এই হাদিসের অর্থ যদি ব্যাপক ও আবশ্যকের (উজুবের) ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে, ইমাম না থাকা অবস্থায় সকলের জন্যই, সব দল থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া আবশ্যক। তখন এর ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, খিলাফত না থাকা অবস্থায় মুসলিমরা দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্য যত দল করেছেন তার সবগুলোই সরাসরি হাদিসের লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে এবং নাজায়েয একটি কাজ হবে। এমন দলগুলোর সাথে যারা যুক্ত হয়েছে তারা সকলেই গুনাহগার হয়েছে চাই তা যে দলের সাথেই হোক। মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত হওয়া আলেমরা হোক, কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হওয়া আলেমরা হোক বা ইখওয়ানের সাথে যুক্ত ওলামাগণ হোক! অথচ নেফাজে শরীয়তের জন্য লেখক জিহাদ ছাড়া সবকাজকেই জায়েয মনে করেন! দল করাকে তো ক্ষেত্র বিশেষ আবশ্যকও বলেছেন!

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, হযরত তো এই হাদিস থেকে জিহাদের জন্য ইমামের কথা বলেছেন। উপরের উল্লেখিত দলগুলো তো জিহাদী নয়। তাহলে এর জবাবে এই প্রশ্ন করা হবে, হাদিসে কোথায় আছে সবদল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ হলো জিহাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া? হাদিসের কোন অংশে আছে- জিহাদ ছাড়া সব দল করা যাবে? মিছিল-মিটিং করা যাবে? আন্দোলন অবরোধ করা যাবে? এই হাদিস থেকে বুঝা যায় শুধু জিহাদটাই করা যাবে না!

৩. এই হাদিসটি ‘জিহাদের জন্য ইমামের শর্ত’ এই অর্থে দলিল দেওয়া সহিহ নয়। কেননা হাদিসের প্রয়োগ ক্ষেত্র হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাদিসের মূল প্রয়োগ হলো, যখন মুসলমানদের মাঝে কোনো ইমাম না থাকবে আর ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে তখন যে এই কঠিন সময়ে নিজের ইমান আমলের ব্যাপারে ফিতনার আশংকা করবে সে বিরত থাকবে। এই হাদিসকে সামনে রেখে উম্মাহের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণ কী ব্যাখ্যা করেছেন তার কিছু উল্লেখ করা মুনাসিব মনে করছি।

এই হাদিসের মূল অর্থ হলো যখন মুসলিমদের মাঝে কোনো ফিতনা হয়ে যায় এবং সকলের উপর কর্তৃত্ব আছে এমন ইমাম না থাকে তখন ফিতনা থেকে বাঁচতে সকল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. (মৃত্যু ৮৫২ হি.) লেখেন,

وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس احزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها ». (فتح الباري لابن حجر ١٣/ ٣٧، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة كان تامة، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩)

‘যখন মুসলিমদের কোনো ইমাম না থাকবে আর মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেতে থাকবে তখন সকল দল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিবে যদি সম্ভব হয় কোনো ফিতনায় পতিত হওয়ার আশংকা থেকে বাঁচতে।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭)

ইবনে কাসির রহ. (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) এই হাদিসের উদ্দেশ্য কী সে সম্পর্কে লেখেন,

والمقصود أنه إذا ظهرت الفتن، فإنه يسوغ اعتزال الناس حينئذ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " «إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك، ودع أمر العوام». (البداية والنهاية ١٩/ ٣٩، (تحت كتاب الفتن، باب افتراق الأمم) ت التركي، دار هجر، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ ه)

‘হাদিসের উদ্দেশ্য হলো যখন ফিতনার ছড়াছড়ি হয়ে যাবে তখন সকল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ।...।’ (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১৯/৩৯)

মূলত এই হাদিসের মূল পাঠ হলো, যে নিজের ব্যাপারে ফিতনার আশংখা করবে সে বিরত থাকবে। যুগে যুগে যখনই ইমাম নিয়ে বা ক্ষমতার দ্বন্ধ দিয়ে অথবা কোনো ফিতনা ব্যাপক আকারে ধারণ করলে কেউ নিজের ব্যাপারে ফিতনার আশংকা করেছেন তারা এই হাদিস উপরের আমল করেই তখন সব দল থেকে এবং সকল কার্যক্রম থেকেই নিজেকে ঘুটিয়ে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এটাই সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনদের একদলের আমল ছিলো। এবং তারা এই হাদিস থেকে এমন মর্মই বুঝেছেন। নিজেদের বিরত থাকাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেননি বা কাউকে মাজাম্মাত করেননি।

ইবনে কাসির রহ. (মৃত্যু ৭৭৪ হি.) এই হাদিস উল্লেখ করে লেখেন,

«وقد اعتزل جماعة من السلف الناس والجمعة والجماعة وهم أئمة كبار: كأبي ذر وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وسلمة بن الأكوع في جماعة من الصحابة، حتى اعتزلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفته

الحديث في فضل الصلاة فيه، فكان لا يشهد جمعة ولا جماعة، وكان إذا ليم في ذلك يقول: ما كل ما يعلم يقال. وقصته معروفة، وكذلك اعتزل سفيان الثوري وخلق من التابعين وتابعيهم; لما شاهدوه من الظلم والشرور والفتن خوفا على إيمانهم أن يسلب منهم». (البداية والنهاية ١٩/ ٤٠، (تحت كتاب الفتن، باب افتراق الأمم) ت التركي، دار هجر، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ)

সালাফদের একটি দল সমস্ত মানুষ, জুমআ এবং জামাত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, অথচ তারা ছিলেন বড় আইম্মায়ে কেরাম। যেমন সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু জর, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, সালাম ইবনুল আকওয়া রা. প্রমূখ। তারা মসজিদে নববীতেও নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছেন অথচ সেখানে নামাজ পড়লে হাজার রাকাত নামাজ পড়ার ছাওয়াব! ইমাম মালেক, সুফিয়ান ছাওরী ও তাবেয়ীদের একদলও যখনই নিজেদের ব্যাপারে কোনো ফিতনার আশংকা করেছেন তারা সবকিছু থেকে বিরত হয়ে গিয়েছেন। (বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ ১৯/৪০)

তৃতীয় দলিল :

মুহতারাম লেখক এরপর ফিকহের দুটো দলিল এনেছেন ইমাম বা রাষ্ট্র জি*হা*দের জন্য শর্ত বুঝাতে কিছু ফিকহের দলিল এনেছেন। মুহতারাম লেখক ইবনে কুদামার দলিল এনেছেন,

وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده

অথচ ইবনে কুদামা তিনলাইন নীচেই তো উনার কথাটি দ্বারা শর্ত বুঝাচ্ছে, না কী বুঝাচ্ছে তা স্পষ্ট করেই দিয়েছে!

فإن عدم الإمام، لم يؤخر الجهاد؛ لأن مصلحته تفوت بتأخيره. وإن حصلت غنيمة، قسمها أهلها على موجب الشرع. قال القاضي: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام احتياطا للفروج

হযরত কী মূল মাসআলাটি মুরাজাআত করেননি! এটা ভাবাও তো নিজের জন্য বেয়াদবি মনে করি! তাহলে আপনি মুগনীর এই ইবারত দিয়ে কীভাবে সবধরনের জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত প্রমাণ হয় কথাটি কীভাবে বলা যায়!

চতুর্থ দলিল :

লেখক ইমাম ছাড়া জিহাদ করা যাবে না, এটাকে শুধুই ফিকহি পর্যায়ে রাখেননি, বরং এটাকে আহলু সুন্নাহের আকিদা পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। লেখক তার স্বপক্ষে ইমাম তহাবির ইবারত আনেন,

الحج وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ برهم كان أو فاجرهم إلى يوم القيامة لا يبطلها شيء و لا ينقضها.

মুহতারাম এই ইবারত থেকে কীভাবে জিহাদের জন্য রাষ্ট্র বা ইমাম শর্ত হওয়ার প্রমাণ দিলেন?!

এটাকে যদি প্রমাণ হিসেবে ধরি, তাহলে তো এখানে হজ্জ আর জিহাদের কথা এক সাথে এসেছে, তো জিহাদের জন্য যদি এই ইবারত থেকে রাষ্ট্র আবশ্যক হয় তাহলে হজ্জের জন্য কেন হবে না?

দ্বিতীয়ত মুহতারাম! এই এবারতের উদ্দেশ্যই তো পরিপূর্ণ ভিন্ন! এখানে উদ্দেশ্য হলো রাফেজিদের খণ্ডন করা! তাদের আকিদা হলো ইমাম মাসুম না হলে তার অধীনে জিহাদ করা জায়েয নেই, এর পরিপ্রেক্ষিতে আহলুস সুন্নাহের ইমামদের আকিদা হলো ইমাম ফাসেক হোক বা আদেল তারা জিহাদের কাজ আঞ্জাম দিলে তাদের অধীনে থেকে জিহাদ করতে হবে! এতটুকু! এটাকে আপনি জিহাদের শর্ত বানিয়ে দিলেন? জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত? এবং এটা আকিদা?

হযরত আজ পর্যন্ত আকিদাতুত তাহাবীর হাজারো শরাহ হয়েছে খেলাফত ধ্বংস হওয়ার পূর্বে! কেউ কী এই ইবারত থেকে আপনি যে নতিজায় পৌঁছেছেন এটা বুঝেছে! আর ইকদামি ও দিফায়ী উভয়ের জন্যই এটা বুঝেছে!

পঞ্চম দলিল:

মুহতারাম লেখক পঞ্চম প্রকারের দলিল দিয়েছেন- খেলাফতের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে দেওয়া কিছু ইমামের বক্তব্য!

মুহতারাম লেখক, ফিকহের এত সরিহ জুযইয়্যাহ থাকতে কীভাবে এমন অস্পষ্ট বিষয়গুলোকে নিজের পক্ষের দলিল বানান ঠিক বুঝলাম না! হযরত! রাষ্ট্রের সংজ্ঞা বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা

বুঝানোর জন্য যেগুলো আমাদের ইমামগণ উল্লেখ করেছে সেগুলো তো শুধু একটি রাষ্ট্রের বা ইমামের জিম্মাদারী ও কাজগুলো সূচারু আঞ্জামের জন্য ইমাম থাকা প্রয়োজন এটা বুঝানো উদ্দেশ্য, ইকদামি বা দিফায়ী জিহাদের দলিল বা শর্ত আলোচনা করা সেগুলোর উদ্দেশ্য ? যদি হয় তাহলে রাষ্ট্র না থাকলে আমল বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারও তো করা যাবে না! মজলুমের সাহায্য করার জন্যেও তো তাহলে ইমাম লাগবে! আপনি ইবনে তাইমিয়ার ইবারত এনেছেন,

ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة

এখানে ইবনে তাইমিয়া রহ. জিহাদের সাথে আরো কতগুলো মাসআলা আলোচনা করেছেন রাষ্ট্র যারা যা করা যাবে না, এখান মুহতারম লেখক শুধু জিহাদকেই কোন দলিলের ভিত্তিতে আলাদা করে ফেললেন! জুম্মা, ঈদ, মজলুমের সাহায্য এগুলোর কিছুই কী ইমাম আর রাষ্ট্র ছাড়া করা যাবে না!

আগামী পর্বে ইতিহাসের অংশটি নিয়ে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ!

চতুর্থ পর্ব:

এই পর্বের শূরুর আগে লেখকের জিহাদ বিষয় একটি লেখা আমি বুঝিনি, সেটা এখানে দিচ্ছি আপনারা বুঝলে আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন।

১. লেখক আবু বাসির রা.-এর জিহাদের ব্যাপারে লেখেছেন, **"(প্রতিশোধ মূলক প্রত্যাঘাত)...এটা জিহাদ নয়, ওয়াজিবও নয়, এটা ব্যক্তিগত বিষয়"** পৃ.৩০৬

২. এরপর জিহাদের জন্য একটি শর্ত উল্লেখ করে লেখেন, **"স্বীকৃত রাষ্ট্র মুজাহিদগণের হাতে না থাকলে অন্তত 'তাহায়্যুয' থাকা। তায়ায়্যুয মানে এমন নির্ধারিত সামরিক অঞ্চল মুজাহিদগণের দখলে থাকা, যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়, ঘাটি গেড়ে যুদ্ধের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়। আবু বসীর রা. এর ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি মদিনার বাইরে একটি স্বাধীন এলাকায় ঘাটি গেড়েছেন এবং শত্রুর উপর হামলা করেছেন"** পৃ. ৩২৪

৩. এর কয়েক পৃষ্ঠা আগে লেখক শিরোনাম দেন, **"সাহাবায়ে কেরাম রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাহিরে যুদ্ধে লিপ্ত হননি।"** পৃ. ৩১৯

এক আবু বসির রা.-এর ঘটনা এনে লেখকের বিভিন্ন ফলাফল আসলে কী! একবার বলছেন আবু বসিরের ঘটনা জিহাদ নয়; ব্যক্তিগত আমল। পরে আবার জিহাদের শর্তের জন্য উনার আমলকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করছেন। আবার বলছেন, সাহাবারা স্বীকৃত রাষ্ট্রের বাহিরে যুদ্ধ করেনি! আমি আসলে কথাটা বুঝিনি, কেউ বুঝলে আমাকে একটু বুঝাবেন।

সামনে যাওয়ার আগে মুহতারাম লেখকের কাছে আমার প্রশ্ন,

১. আবু বাসির রা. আরবের সবচেয়ে শক্তিধর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কয়েকজন মিলে একসাথে হয়ে যুদ্ধ করার দ্বারা তায়ায়্যুয হয়ে গেছে! এতটুকু তায়ায়্যুয পাওয়া গেলেই কী শর্ত পূর্ণ হবে?

২. আবু বসিরের জিহাদকে আপনি প্রতিশোধমূলক জিহাদ বলছেন? এই প্রতিশোধ কিসের প্রতিশোধ? উনাদের অত্যাচার করেছে সেটার প্রতিশোধ? এই ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেই উনারা এভাবে কাফেরদের আক্রমণ করে নিয়মিত হত্যা করা শুরু করেছে?! আপনার আগে কেউ এটাকে জিহাদ হিসেবা স্বীকার না করে প্রতিশোধ শব্দ সাহাবার শানে ব্যাবহার করেছে!?

.

লেখক বইতে জিহাদের বিভিন্ন ধরনের শর্ত উল্লেখ করে লেখেন, **"জিহাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনীয় একটি বিধান। এরজন্য কোনো এলাকার খলিফা, আমীর বা শাসক শর্ত। খলিফা বা আমীর কর্তৃক ঘোষিত আইনানুগ জেহাদের বাইরে কাউকে হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" পৃ. ৩৩৭**

এপর লেখকের সকল শর্ত পাওয়া যায় এমন কিছু জিহাদের নমুনা দেন। তিনি লেখেন, "ওলামায়ে দেওবন্দের তিনটি স্বীকৃত জিহাদ পর্যালোচনা করলেও জিহাদের শর্ত পূরনের বিষয়টি স্পষ্ট পাওয়া যায়।" পৃ. ৩৩৭

এখানে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর জিহাদের ব্যাপারে লেখক আবার মন্তব্য করলেন, **"হাদীস শরীফে জিহাদের জন্য আমীরের শর্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন ক্ষমতা ও কতৃত্ববান আমীন, যার নেতৃত্বে মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হবেন। নিয়মতান্ত্রিক শক্তিধর রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ-নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখণ্ড থাকা শর্ত।"** পৃ. ৩৪০

একবার বলছেন ভূখণ্ড আবার বলছেন রাষ্ট্র! আসলে ভূখণ্ড আর রাষ্ট্র দ্বারা লেখক কী বুঝাচ্ছেন! এতক্ষণ ধারাবাহিক বলে আসলেন রাষ্ট্র, সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর ব্যাপারে এসে বলছেন ভূখণ্ড! যদি এভাবে শুধু ভূখণ্ডই হয় তাহলে পাকিস্তান ছাত্রদের জিহাদের উপর হযরতের আপত্তি কেন! উনাদের আমির আছে, আঞ্চলিক নিরাপদ ভূমিও আছে! শক্তিশালী অস্ত্র আছে, আছে জিহাদের পূর্ণ ম্যাপ!

যাইহোক, হযরত আপনি সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর জিহাদকে বলছেন সমস্ত শর্ত পাওয়া গেছে! কিন্তু আমাদের জানা মতে আপনার উল্লেখিত অনেকগুলো শর্তই সাইয়েদ সাহেবের কাছে ছিলো না। কারণ লোকেরা যখন সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর হাতে প্রথম বাইয়াত নেয় সে বাইয়াতের শব্দ যদিও আম ছিলো কিন্তু সে বাইয়াত ছিলো শুধুই জিহাদের বাইয়াত। এবং সাইয়েদ সাহেবের ক্ষমতাও ছিলো শুধুই তার সাথে অংশগ্রহণকারী ও তার হাতে জিহাদের বাইয়াত দেওয়া ব্যক্তিদের পর্যন্ত। ভুখণ্ডের যাবতীয় দায়িত্ব উনার হাতে ছিলো না। ঐতিহাসিক গোলামে রাসূল মেহের সাইয়েদ আহমদ রহ.কে নিয়ে লেখা বইয়ের এই বিষয়ের বিস্তারির আলোকপাত করেন। এই বিষয়ে তিনি যা লেখেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো, "সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.-এর হাতে বিভিন্ন গোত্র প্রধানগণ যে বাইয়াত নিয়েছিলো তা শুধু জিহাদের বিষয়ে ছিল। এছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে তারা ছিলো স্বাধীন। অর্থাৎ এটা কোনো অর্থেই খিলাফত বা ইমামতে উজমার বাইয়াত ছিলো না।" (দেখুন তাহরিকে সাইয়েদ আহমদ শহিদ-গোলাম রাসূল মেহের ১/৪৮৬-৮৭)

এছাড়া আরেকটি বিষয় হল, ইতিহাস থেকে এটা প্রমাণিত যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ. মানুষ থেকে ইমামতের বাইয়াত নেওয়ার পূর্বেই জিহাদের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। সাইয়েদ সাহেব ইমামতের বাইয়াত নেন ১২ জুমাদাল উখরা বৃহস্পতিবার। তার প্রায় বিশদিন পূর্বে ২০ জুমাদাল উলা ১২৮২ হিজরী (১৮২২ খ্রি) সালে শিখদের সাথে আখুড়ার যুদ্ধ। এবং এরপর হাযারুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ১/৫২০, ৫২৫, মাজলিসে তাহকিকাত লখনো)

এখন জিহাদ সহিহ হওয়ার জন্য যদি ইমামের শর্ত আবশ্যক হয় তাহলে এই কথা বলতে হয়, মুজাহিদিনদের এই দুই আক্রমণ অবৈধ হয়েছে!

শামেলির যুদ্ধ:

মুহতারাম লেখক শামেলির যুদ্ধের ব্যাপারে লেখেন, **"১৮৫৭ সনে ভারতের আরও বিভিন্ন এলাকায় দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। দিল্লিতে মোঘল বাদশাহ তখনও বিদ্যমান। সব জায়গার বিদ্রোহিরা দিল্লির বাদশাহের পক্ষে এই বিদ্রোহে অংশ নেয়।... ঐ সময় বাদশার পক্ষে আলেম-উলামা শামেলীতে বিদ্রোহ করে এবং সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন।"** পৃ. ৩৪২

হযরত এখানে দুটো ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমত. ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ দিল্লির বাদশাহের তত্ত্বধানে শুরু হওয়ার কোনো বিদ্রোহ নয়। বরং সম্পূর্ণ একক কিছু ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় শূরু হওয়া একটি বিদ্রোহ। যা মিরাঠে প্রথম প্রকাশ পায়, তখনও মোঘল বাদশাহ এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এরপর যেন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়, তাই বিদ্রোহীরা বাদশাহের হাতে যুদ্ধের বিষয় ন্যস্ত করে আর এটাই ছিলো যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ভুলের একটি!

মুহতারাম আপনার জ্ঞাতার্থে ১৮৫৬-এর যুদ্ধের পূর্বের অংশটুকু আমি একটু মুজাকার হিসেবে বলি,

ব্রিটিশদের ভীত নাড়িয়ে দেওয়া এই পুরো যুদ্ধের যিনি মাস্টারমাইন্ড ছিলেন তিনি হলেন একজন সুফি আলেম মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ। সুলতান টিপুর একজন সহকারী মুহাম্মদ আলির ঘরের ১২০৬ হি.তে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। যুবক বয়সে তিনি কলন্দরের পীর মেহরাব শাহের হাতে বাইহাত হন। বাইয়াতের শর্ত ছিলো, "জিহাদের শুকনো রগের মাঝে তাজা খুন প্রভাহিত করবেন এবং ইংরেজদের এই দেশ থেকে বিতারিত করবেন।'' - ওলামায়ে হিন্দ কা সানদার মাজি পৃ. ২১০-২১৩ (কিতাবিস্থান দিল্লী, প্রকাশকাল ১৯৮৫ ইং)

মাওলানা আহমদুল্লাহ তার পুরো জীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। গোপনে মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করতে থাকেন জিহাদের জন্য। ব্রিটিশদের হিন্দের ভুখণ্ড থেকে চিরতরে বিদায় করতে তিনি এক গোপন মিশন শুরু করেন। তার সকল কাজ ছিলো পূর্ণ গোপনীয়তার সাথে; গোপনে মুজাহিদ সংগ্রহ করা, মানুষকে জিহাদের জন্য উদ্ধব্ধ করা, মুজাহিদদের জন্য রসদ ব্যবস্থা করা, সেনাবাহিনীর মাঝে গোপনে জিহাদের নতিপত্র আর

ফতোয়া বিলি করা ইত্যাদী। এধরনের কাজই হয়ে দাঁড়ায় তার জীবনের একমাত্র কাজ। তাই মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া সাহেব ১৮৫৭-এর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে শাহ আহমদুল্লাহের পরিচয় করিয়ে দেন এই শব্দে, 'রঈসুল মুজাহিদিন' মুজাহিদিনদের নেতা। (ওলামায়ে হিন্দ কা সান্দার মাজি ২২৫)

মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে গোপনে জিহাদের কার্যক্রম চালিয়ে যান। তার কার্যক্রম এতটাই গোপন থাকতো যে, তার অনেক মুরিদরা পর্যন্ত তার আসল নাম জানতো না। কেউ চিনতো সিকান্দার শাহ, আবার কারো কাছে পরিচিত ছিলেন আহমদুল্লাহ শাহ নামে। কখনো এক জায়গায় স্থির থাকতেন না। গোপনে পুরো দেশের এপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরে বেড়াতেন আর মানুষকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করতেন। ১৮৪৬ সাল থেকেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের আন্দোলন নিয়ে পুরো দেশে সফর শুরু করেন। গোপনে তিনি সড়কে, মসজিদের সামনে, ঈদগাহে ইত্যাদি ঐ সকল স্থান যা সহজেই মানুষের চোখে পড়ে সেখানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া টাঙ্গিয়ে দিতেন। কাজের ধরনের গোপনীয়তা এতটাই ছিলো যে, উন্নত গোয়েন্দা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শাহ আহমদুল্লাহের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্মেন্ট কোনো সুনিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। তবে তারা বিভিন্ন সোর্স থেকে এতটুকু বুঝতেছিলো দেশব্যপি কিছু একটা হচ্ছে, যার পিছনে আছে এই মৌলভি আহমদুল্লাহ! ২১ নভেম্বর ১৮৫৬ সালে লখনৌর বিখ্যাত পত্রিকা তিলমাসে মাওলাকে সন্দেহভাজন বলে খবর ছাপা হয়। তিলমাসের এই খবর প্রচার হওয়ার পর মাওলানা নজরবন্দি হন। পরে সেখান থেকে পালিয়ে ফয়জাবাদ চলে আসেন। এখানে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জেলে দেয়। পরে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলে মানুষ জেল ভেঙ্গে তাকে মুক্ত করেন। ১৮৫৭-এর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করে ম্যালেসন দাবী করেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই লোকটি (মাওলানা আহমদুল্লাহ) ছিলো বিদ্রোহের মাষ্টারমাইন্ড। (দ্য ইন্ডিয়ান মিউনিটি অব ১৮৫৬ (পৃ.১৮-৩৩) বইয়ের উদ্ধৃতিতে '১৮৫৭ স্বাধীনতা যুদ্ধের উপখ্যান'-ইমরান রাইহান পৃ.৩৪-৩৫ ও ১০৪-১০৫)

হযরত এই যে, পুরো বিদ্রোহের মাষ্টার মাইন্ড! উনার এই কার্যক্রমগুলো কী জায়েয হয়েছে!? উনার এই পুরো কাজের সময় তো বাদশাহ জানতই না! তাহলে বাদশাহের অধীনে থেকে

কীভাবে জিহাদ হলো? তাহলে কি উনার এই কাজটা জিহাদ হয়নি?! আমাদের আকাবিররা যে, এই আহমদুল্লাহকে মহান মুজাহিদ হিসেবে লেখেছেন! সেটা তাহলে কী?

এরপর মুহতারাম এটার জের ধরে লেখেছেন, " ঐ সময় বাদশার পক্ষে আলেম-উলামা শামেলীতে বিদ্রোহ করে এবং সেখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন।"

হযরত! সেদিন আমাদের আকাবিরগণ বাদশাহের পক্ষ থেকে এই জিহাদ শুরু করেছে! এমন কোনো নতিপত্র আসলেই আছে? যদি বাদশাহের পক্ষ থেকেই বিদ্রোহ হয় তাহলে কেন সেদিন মজলিসে কিছু আলেম ইমামতের মাসআলা উঠালো?

হযরত! সারাপৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপার পাওয়ার, যাদের অধীনে প্রায় পুরো অর্ধেকের মত পৃথিবী! তাদের বিরুদ্ধে, দিল্লির একটি ছোট্ট গ্রামে নিজের কয়েকজন শাগরেদের হাতে ইমামতের বাইয়াত, সেনাপতি আর কাজি নির্ধারন করে যদি জিহাদ সহিহ হয়, যাদের সরঞ্জামাদি ছিলো সবমিলিয়ে, "কয়েকহাজার মুজাহিদদের কাছে ছিলো মাত্র কয়েকশোর মত কিছু পুরানো সাধারণ বন্দুক। বাকিদের কাছে ছিল কিছু তলোয়ার, তীর, নেজা ইত্যাদি"— এগুলোর মাধ্যমে আপনার দেওয়া এতগুলো শর্ত যদি হয়ে যায়, তাহলে এই দুনিয়ার সব জিহাদেই আপনার দেওয়া সকল শর্ত পাওয়া যাবে!

সোভিয়ত আমলে আফগানিদের যুদ্ধ!

আপনি পুরো বই জুড়ে আলোচনা করে আসলেন রাষ্ট্রের আর ঠিক তাতবিকের আগেই হঠাৎ ভুখণ্ডের কথা উঠালেন এটা তো ঠিক বুঝলাম না, এরপর আফগান যুদ্ধে এসে অতিরিক্ত বলছেন, "আফগানিরা প্রথমে আঞ্চলিক আমিরের নেতৃত্বে যুদ্ধ চলতে থাকে"

হযরত! সেখানে সবাই আঞ্চলিক আমিরের অধিনে ছিলো! বরং পুরো যুদ্ধ শুরুই হয় আফগানের দারসাখিল অঞ্চলের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা আব্দুল গনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতোয়া জারি করার মাধ্যমে। আর সর্বপ্রথম এটাতে সাড়া দেন মাওলানা ইউনুস খালেস, যিনি কোনো আঞ্চলিকের আমীর ছিলো না। ছিলো নিজের দলের! পরে জালালুদ্দিন হক্কানীসহ অন্যরা নিজেদের জায়গা থেকে কাজ শূরু করেন! ইতিহাসবিদ মাওলানা ইসমাইল রেহান সে সময়ের মুজাহিদদের বিভিন্ন দলগুলোর প্রকারকে এভাবে ভাগ করেন,

১. **আলিম** : এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা ইউনুস খালিস, জালালুদ্দিন হক্কানী, মাওলানা আরসালান খান রাহমানি প্রমুখ।

২. **সুফি ও আধ্যাতিক ব্যক্তি** : এখানে নকশবন্দি সিলসিলার মাওলানা মুহাম্মদ নবি প্রমুখ ও কাদেরিয়া তরিকার বিখ্যাত বুজুর্গ সাইয়েদ আহমদ গিলানি।

৩. **আধুনিক শিক্ষিতসমাজ** : এদের মধ্যে গুলবুদিন হেকমতিয়া, বুরহানুদ্দিন, আহমদ শাহ মাসউদ প্রমুখ ছিলেন।

৪. **আফগান বাহিনী থেকে চলে আসা ব্যক্তি** : এদের মধ্যে ফিল্ড কমান্ডার ইসমাইল খান অন্যতম।

হযরত! বিভিন্ন দল প্রথমে নিজেদের জায়গা থেকে জিহাদের কাজ শুরু করে, পরে অঞ্চল জয় হয়, বহিরা সাহায্য আসে আরো বহু পরে! ইতিহাসে এটা স্পষ্ট পাওয়া যায়, যুদ্ধের একদম শুরুর দিকে আফগানিদের কাছে সে সময়ের সুপার পাওয়ার সোভিয়তের ট্যাংক আর ফাইটারের বিরুদ্ধে তাদের অস্ত্র ছিলো নিতান্তই সামান্য!

এরপর লেখক মোল্লা ওমরের কাহিনী টেনেছেন! হযরত মোল্লা ওমর যখন তালেবান আন্দোলন শুরু করেন, তখন আফগানে শাসক ছিলো। কান্দাহার সে শাসকের অধিনে ছিলো। শাসকরা মুসলিম ছিলো। কাবুল একজন মুসলিম শাসকের অধিনে ছিলো। আপনি পুরো বইতে বলেছেন, মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে যেখানে শাসক আছে সেখানে অস্ত্রের মাধ্যমে নেফাজে শরিয়তের জন্য চেষ্ঠা করা যাবে না। আগে রাষ্ট্র গঠন হবে তারপর! মোল্লা ওমর কী দাওয়াত আর তানজিমের মাধ্যমে প্রথমে রাষ্ট্র গঠন করেছে? না নেফাজে শরীয়তের জন্য অস্ত্র তুলে নিয়েছে! মুহতারাম লেখক লেখেছেন, **“যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুশ মুসলমান, সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম কিংবা বৈশ্বিকভাবে মুসলিম কমিউনিটিভুক্ত, বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির কাছে যে রাষ্ট্র মুসলিম দেশরূপে চিহ্নিত, যেখানকার সরকার, সামরিক বাহিনী, আইন ও বিচার বিভাগ মুসলমানদের প্রভাবাধীন,যদিও রাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়া কাঙ্খিত মাত্রায় প্রতিপালিত হয় না এখানে নেফাজে শরীয়তের জন্য যুদ্ধ করা বৈধ নয়”** পৃ. ৩৪৬

হযরত মোল্লা ওমর যখন কাজ শুরু করেন, তখন আপনার বলা প্রতিটি শর্ত সেখানের আফগান শাসকদের মাঝে ছিলো। বিশেষ করে কান্দাহারে, যেখানে মোল্লা ওমর কাজ শুরু করেছে। কাবুলে ছিলো! তাহলে উনার কাজটি কেন জায়েয হলো! উনার কাছে তো প্রথম দিকে তেমন কিছুই ছিলো না। কিছু ছাত্র দিয়ে আর পুরাতন সোভিয়ত আমলের বন্ধু দিয়ে উনার যাত্রা শুরু! সেটা আপনার বলা এতগুলো করা শর্ত অতিক্রম হয়ে গেলো? আর পরে আপনি যাদের ব্যাপারে বললেন তাদের হলো না?

মুহতারাম! আমাদের মাফ করবেন! আপনার দ্বিমুখি কথা, আর এমন অদ্ভুত তাতবিক কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না!

পঞ্চম পর্ব:

পিছনের চার পর্বে লেখকের একটা বড় ও মৌলিক মাসআলায় আমাদের দলিলে আলোকে যে দ্বিমত ছিলো তা তুলে ধরেছি। এপর্বে লেখকের আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। লেখক মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার সংক্রান্ত বেশ আলোচনা করেছেন, সে আলোচনাতে লেখক ইসলামের উদারতা ও মহানুবতা তুলে ধরার চেষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আমার কাছে পুরো আলোচনা পড়ার পর এই উদারতাটা সেক্যুলার রাষ্ট্রের সাথে বেশি সামঞ্জাস্য মনে হয়েছে। আমাদের ফিকহের তুরাসের সাথে নয়।

মুহতারাম লেখক লেখেন, "ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক, যারা রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করেছে, তাদের জানমাল, ইজ্জত আব্রু সংরক্ষিত। **তারা মুসলমানদের ন্যায় সমান মৌলিক নাগরিক অধিকার লাভ করে এবং তাদের ধর্মকর্ম পালনে পূর্ণ সুবিধা থাকে।**" পৃ. ২৪৮

অপর স্থানে লেখেন, "**ইসলামী আইনের বশ্যতা স্বীকার করার পর তারা সকল নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমস্তরের। এক্ষেত্রে আইনগত তাদেরকে দ্বিতীয় বা নিচু শ্রেনীর নাগরিক মনে করার কিছু নেই।**" পৃ.২৫১

আমাদের ফিকহের তুরাসে প্রায় প্রতিটি কিতাবে কাফেরদের সাথে মুসলিমদের অধিকার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমরা কীভাবে থাকবে এই

বিষয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে। বইতে মুহতারাম লেখক যে তাসাওউর দিয়েছেন তার সাথে আসলে আমরা আমাদের তুরাসের তেমন মিল পাই না। বরং ফুকাহাদের তাফসিলের সাথে লেখকের 'সমস্তরের' এই চিন্তাকে বাতিল বলেই মনে হয়। বরং একজন মুসলমান বইয়ের এই তাসাওউর পড়ার পর যদি কখনো তাফসির ইবনে কাসিরের বাংলা খুলে হযরত ওমরের "শুরুতে উমরিয়্যাহ" দেখে তাহলে সে শর্তগুলোকে উগ্রবাদি ভাবা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না! আল্লাহর কাছে পানাহ। আমি ইবনে জামাআ রহ.-এর থেকে "শুরুতে উমরিয়্যার" কিছু শর্ত উল্লেখ করছি, সেখানে এই 'সমস্তরের' দর্শনের কী আদৌ কোনো মিল আছে!

«وان لا يمنعوا أحدا من المسلمين المسافرين من النزول في كنائسهم، وأن يطعموهم الطعام، ويضيفوهم ثلاثا، ويوسعوا لهم ولدوابهم أبواب الكنائس، ولا يضربوا فيها النواقيس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا فيها أصواتهم بالقراءة والصلاة بحيث يسمعهم المسلمون، ولا يجتمعوا فيما كان منها من خطط المسلمين، ولا يحدثوا في بلاد الإسلام ديرا، ولا كنيسة، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يأووا فيها، ولا في شيء من منازلهم (٩٧ / أ) جاسوسا لعدو المسلمين، ولا يظهروا شركا، ولا يدعوا إليه، ولا يظهروا صليبا على كنائسهم، ولا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم، ولا كتابا من كتبهم، ولا يتعلموا القرآن، ولا يعلموه أولادهم، ولا يمنعوا أحدا منهم، أو من غيرهم، من الدخول في الإسلام إذا أراده، وان يوقروا المسلمين، ويقوموا لهم من مجالسهم، ويعظموهم، ويرشدوهم في سبلهم وطرقاتهم، ولا يطلعوا في منازلهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في هيئاتهم أو ملابسهم في قلنسوة أو عمامة، ولا سراويل، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يكتبوا بكتابهم، ولا ينقشوا»ولا يظهروا مع موتاهم نارا في طريق المسلمين، ولا يرفعوا أصواتهم في جنائزهم، ويكشفوا وجوه موتاهم، ولا يجاوروا بموتاهم موتى المسلمين، ولا يكتموا أمر من غش المسلمين، ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، وان يجزوا مقادم رؤوسهم ويلغوا نواصيهم، ويشدوا الزنانير في أوساطهم، ولا يمشوا إلا بزنار، ويلزموا زيهم حيث كانوا، ولا يضربوا أحدا من المسلمين، ولا يرغبوا أحدا في دينهم، ولا يدعوا إليه أحدا، ولا يشارك أحد منهم مسلما في تجارة إلا أن يكون أمر التجارة إلى المسلم، ولا يشتروا من سبينا شيئا. (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص٢٥٤)

এখানের কোনো বিষয়ের সাথেই কী মুহতারাম লেখকের 'সমস্তরের' দর্শনের কোনো মিল রয়েছে কী?! শুধু একটি বাড়ি যেটা মানুষের অধিকার সেখানের বিষয়ে ফুকাহারা কত শক্ত কথা বলেছে! ইবনে জামাআ রহ.-এর ইবারতটুকুই দেখুন,

«في حكم مساكنهم وكنائسهم ومراكبهم: يمنعون من رفع البناء على بناء جيرانهم المسلمين، **وهو حق الدين فلا يسقط برضا الجار،** ويمنعون من المساواة أيضا، وإذا كان بناء الجار المسلم في غاية القصر، فإن تملكوا دارا عالية أقروا عليها، فإن انهدمت منع من رفعها، والمساواة كما لو ابتدأه فكل ما أحدث من الكنائس في هذا (٩٨ / ب) النوع من البلاد وجب هدمه. وأما الكنائس القديمة قبل الإسلام، فإن كانت في بلد فتح عنوة: كمصر، وبر الشام وبعض بلاده، وجب هدمها. وإن كانت في بلاد فتحت صلحا، وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس بقيت». (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص٢٥٦)

এখানে ইবনে জামাআ রহ. অমুলিমদের বাড়ি সম্পর্কে যে ইল্লত বলছে, এটা ধর্মের অধিকার, কোনো মুসলিমদের তার ভিন্ন করার সুযোগ নেই!

মুহতারাম লেখেক লেখেছেন, ধর্মীয় বিষয়েও তারা মুসলামানদের মত "সমস্তরের" অধিকার পাবে। যেখানে ফুকাহায়ে কেরাম তাদের ধর্মের সবচেয়ে বড় বিষয় পার্থনালয় নিয়ে এভাবে তাফসীলি আলোচনা করেছেন, সেগুলো দেখলে কী সমঅধিকার কোনোভাবেই ফুটে উঠে? আমি শুধু এখানে ইবনে হুমামের ইবারতটুকু দিচ্ছি,

«قيل أمصار المسلمين ثلاثة: أحدها ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط، فلا يجوز فيها إحداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم، ولا يمكنون فيه من شرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس. وثانيها ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز فيها إحداث شيء بالإجماع، وما كان فيها شيء من ذلك هل يجب هدمه؟ فقال مالك والشافعي في قول وأحمد في رواية: يجب. وعندنا جعلهم ذمة أمرهم أن يجعلوا كنائسهم مساكن، ويمنع من صلاتهم فيها ولكن لا تهدم، وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد؛ لأن الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة، ولم يهدموا كنيسة، ولا ديرا، ولم ينقل ذلك قط. وثالثها ما فتح صلحا، فإن صالحهم على أن الأرض لهم والخراج لنا جاز إحداثهم، وإن صالحهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية فالحكم في الكنائس على ما يوقع عليه الصلح، فإن صالحهم على شرط تمكين الإحداث لا يمنعهم، إلا أن الأولى أن لا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر - رضي الله عنه - من عدم إحداث شيء منها، وإن وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث ولا يتعرض للقديمة ويمنعون من ضرب الناقوس وشرب الخمر واتخاذ الخنزير بالإجماع انتهى». (فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي ٦/ ٥٨)

ইবনে জামায়ার ইবারতটুকু দেখুন,

«وليس لهم أحداث كنيسة أو دير أو صومعة في بلاد أحدثها المسلمون: كالقاهرة، والبصرة، والكوفة. ولا في بلد أسلم أهلها: كالمدينة النبوية، واليمن. ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة: كمصر، وبر الشام، وبعض بلاده حرسهما الله تعالى». (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص٢٥٦)

এই ইবারতদুটো কী কোনোভাবেই 'সমস্তরের' তাসাউওর উঠে আসে!

মুহতারাম লেখক "সমস্তরের" বিষয়ে বিশাল আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন দলিল দিয়ে ইসলামের উদারতা ও সমঅধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করে লেখেছেন। এরকম বিশাল দালালিক আলোচনার পর সম্ভবত ফিকহের এই ইবারতগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে একদম শেষে ছোট্ট করে লেখেছেন, "**সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ইসলাম অনৈসলাম যেন গুলিয়ে না যায়, তার স্বার্থে কিছু অধিকারে যৌক্তিক পার্থক্য ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মালম্বীর নিজ নিজ পরিবেশে ধর্মকর্ম পালনের অধিকারসহ অন্যান্য সামাজিক ও নাগরিক অধিকারসমূহ সংরক্ষিত থাকে।**" পৃ. ২৫৫

প্রথমত, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিমের অধিকারের মাঝে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরো আলোচনায় কেন সমান অধিকার শব্দ প্রয়োগ করলেন? এ থেকে কি ধোঁকা খাওয়া সম্ভব নয়?! যেহেতু তিনি নিজেই পরবর্তীতে (তার ধারণা অনুযায়ী) একটু পার্থক্যের দিকে সামান্য ইঙ্গিত করেছেন, এজন্য শুরু থেকেই বিষয়টি সেভাবে আলোচনা করলেই ভালো হতো না কি? পার্থক্য থাকলে কি সেটাকে সমান অধিকার বলা হয়?!

যদি এটাকে শাব্দিক ভুল বলেও মেনে নিই তাহলে দ্বিতীয় কথা হলো, পার্থক্য কি সামান্য কয়েকটি অধিকারে সীমাবদ্ধ? তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের কিতাবে কি সামান্য কিছু পার্থক্যের কথা রয়েছে নাকি বিশাল পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে? যে পার্থক্যগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে কি কোনোভাবে উভয় গোষ্ঠীকে সমস্তরের কাছাকাছিও রাখে নাকি নিশ্চিতভাবেই মুসলিম ও অমুসলিমদের একটা শ্রেণীগত পার্থক্য স্পষ্ট করে?

তৃতীয় কথা হলো, এত বড় বড় পার্থক্যগুলোকে একপাশে রেখে যদি পার্থক্যের বিষয়গুলোর মৌলিকত্বকে আমরা সামনে রাখি তাহলে কি সেগুলোকে শুধুই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বলা যায়?! এসব পার্থক্যে কি কোনোভাবেই তাদেরকে ছোট করে দেখানো হয় না? তাদের

প্রতি লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা চাপিয়ে দেওয়া হয় না?! নিঃসন্দেহে ইসলাম জুলুম করে না, কিন্তু সবাইকে সমানও বলে না। যে পার্থক্যগুলোর কথা উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন সেগুলোকে শুধুই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য বলা একটি ধোয়াশা ছাড়া আর কিছুই না। উলামায়ে কিরাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, মুসলিমদের সাথে জিম্মিদের এসকল পার্থক্য তাদেরকে ছোট, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করার জন্যই। এবং এগুলো কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার আদেশ (و هم صاغرون) তথা (যতক্ষণ না তারা অপদস্থিত, লাঞ্ছিত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে) এরই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। এখানে ইবনে হুমাম রহ.-এর "পার্থক্যের" বিষয়ে একটি ইবারত দেখি, তিনি লেখছেন,

وإذا وجب التميز وجب أن يكون بما فيه صغار لا إعزاز؛ **لأن إذلالهم لازم بغير أذى من ضرب أو صفع بلا سبب** يكون منه، بل المراد اتصافه بهيئة وضيعة ولذا أمروا»

পার্থক্য আবশ্যক, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের নীচুতা ও যিল্লতি প্রকাশ হয়। -ফাতহুল কাদির

এখানে কী পার্থক্য কী শুধুই ধর্মীয় বিষয়েই হয়েছে! নাকি এখানে ইল্লত ও কারণ ভিন্নকিছুকেই দর্শানো হচ্ছে!

এরপর আরো অস্পষ্ট যে বিষয়টা লেগেছে সেটা হলো জিযিয়ার বিষয়। মুহতারাম শিরোনাম দেন **//জিযিয়া কর//** এর স্বপক্ষে আয়াত উল্লেখ করেছেন সূরা তাওবার বিখ্যাত আয়াতটি। হযরত আপনি যে আয়াত এখানে উল্লেখ করেছেন সেটা তো সম্পূর্ণ জিযিয়ার সাথেই খাস! করের সাথে নয়। কর এক জিনিস, জিযিয়া ভিন্ন জিনিস। কারণ আপনি শেষে লেখেছেন, **//জিযিয়া কর প্রয়োগ ওয়াজিবও নয়।// পৃ. ২৫২** কর প্রয়োগ তো ওয়াজিব নয়- স্পষ্ট, কিন্তু কাফেরদের ওপর জিযিয়াও ওয়াজিব নয়!? এখানে আসলে মুহতারামের উদ্দেশ্য কী, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

এরপর আপনি লেখেছেন, **//জিযিয়াকে সদাকাহ বলা যেতে পারে। তারা অসম্মানবোধ করলে অন্যকোনো সম্মানজনক নামেও জিযিয়া আরোপ করা যেতে পারে। আলী রা. এর সাথে পরামর্শ করে উমর রা. আরবের বনু তাগলিবের নাসারাদেরকে যাকাত নামে জিযিয়া আদায়ের সুযোগ দিয়েছেন।//** পৃ. ২৫২

মুহতারামের এই অংশটুকু দেখে আসলে অনেকগুলো ধাধায় পড়ে গেছি! হযরতের সম্ভবত এই অংশটুকু কোনো ফিকহের মাসদার মুরাজায়াত করার সময় হয়নি! নাহলে শুধু হেদায়ার অংশটুকু দেখলেও তো এখানে এমন বলা সম্ভব হতো না! কারণ,

১. হিদায়াতে স্পষ্টই আছে আমাদের হানাফি মাজহাবে হযরত ওমর রা. বনু তাগলিবের সাথে যা করেছেন সেটা জিযিয়াই ছিলোনা বরং তা ছিলো একটি সুলাহ। সুলাহের মাধ্যমে যা নির্ধারন হয়েছে তা দিবে। আর সুলাহ তো জিযিয়া না। তার অন্যতম কারণ হলো জিযিয়া নারীদের উপর আসেনা। কিন্তু বনু তাগলাবের নারীদের উপরও এটা এসেছে। যখন এটা জিযিয়াই না তখন নাম পাল্টানোর সাথে জিযিয়ার নাম পাল্টানোর কী আছে! হেদায়ার ইবারত দেখুন,

«**ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة** " لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم " ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من صبيانهم " لأن الصلح وقع على الصدقة المضاعفة والصدقة تجب عليهن دون الصبيان فكذا المضاعف». (الهداية في شرح بداية المبتدي ٢/ ٤٠٥)

হেদায়ার মুসান্নিফ আরো লেখেন,

«**ولنا أنه مال وجب بالصلح والمرأة من أهل وجوب مثله عليها والمصرف مصالح المسلمين**». (الهداية في شرح بداية المبتدي ٢/ ٤٠٥)

২. বনু তাগলিবের এই সূরতকে যদি জিযিয়া ধরেও নিই, তাহলে বনু তাগলিবের এই সূরতের সাথে যা হয়েছে অন্য সকল ক্ষেত্রে তা-ই হবে। ফিকহের কিতাবে স্পষ্ট আছে, বনু তাগলিবের মত কেউ নাম পালটিয়ে জিযিয়া দিতে চাইলে তার উপর সাধারণ জিযিয়ার ডাবল আরোপ করা হবে। ইবনে জামাআর ইবারত দেখুন,

«**لو سأل من يقر بالجزية أن تؤخذ منه باسم الصدقة لا باسم الجزية، فللإمام أن يجيبه إلى ذلك بشرط تضعيفها بمثلها**، فيؤخذ من المائتين عشرة دراهم، ومن مائة دينار خمسة دنانير، ومن الألف خمسين، وكذلك

في المواشي؛ لأن عمر رضي الله عنه أجاب نصارى العرب إلى ذلك ووافقه الصحابة عليه». (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص٢٥١)

ইবনে হুমাম রহ. বনু তাগলিবের বিষয়টি নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। সুলাহ ও জিযিয়া দুটো দিকের আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন,

«ثم اختلف الفقهاء هل هي جزية على التحقيق من كل وجه أو لا؟ فقيل من كل وجه فلا يؤخذ من المرأة والصبي، فلو كان للمرأة ماشية ونقود لا يؤخذ منها شيء، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. قال الكرخي: وهذه الرواية أقيس وهو قول الشافعي؛ لأن الواجب بكتاب الله تعالى عليهم الجزية، فإذا صالحوهم على مال جعل واقعا موقع المستحق، يؤيده قول عمر - رضي الله عنه - هذه جزية سموها ما شئتم. **وقال أصحابنا: هو وإن كان جزية في المعنى فهو واجب بشرائط الزكاة وأسبابها إذ الصلح وقع على ذلك، ولهذا لا يراعى فيه شرائط الجزية من وصف الصغار فيقبل من النائب ويعطى جالسا إن شاء ولا يؤخذ بتلبيبه».** (فتح القدير للكمال ابن الهمام وتكملته ط الحلبي ٦/ ٦٤)

কীভাবে বনু তাগলিবের এই অংশটুকু আপনার দাবীর পক্ষে দলিল হয়? আর অন্য মাজহাব অনুযায়ী দলিল হলেও সেখানের পূর্ণ বিধান তো আপনার লেখায় ফুটে উঠেনি! বা আমার কোথায় ভুল হচ্ছে! কোনো দলিল হয়তো সামনে নেই।

যাইহোক, আমার অল্প মুতাআলায় যা বুঝতে পেরেছি, ইসলাম সমস্তরের কথাও বলে না, এবং সমঅধিকারের তো নয়, ইসলাম বলে ইনসাফের কথা, ইসলামের প্রতিটি বিধান ইনসাফপূর্ণ, চাই সেটা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক! ইসলাম অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার তাই দিয়েছে, যা আমরা আমাদের ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যে পাই। আজ মুসলমান সারা পৃথিবীতে পরাজিত হয়ে আছে। যার কারনে ফিকহের অনেক বিধান আমালান নাফেজ নেই। কবে সে গৌরব ফিরে আসবে তাও অজানা! কিন্তু যদি আজ আমরা তাত্ত্বিকভাবেই ইসলামের বিজিত রূপকে বিকৃত করে ফেলি তাহলে বিজয় আসলেও তো আমরা পরাজিতই থেকে যাবো!